খদ্যোত

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—কার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

"মুদ্রণী"

১৯বি, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার

কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

শ্রীযুত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-চিত্র-পরিব্রজন-রস-রসিকেষু

।

শেষের গল্প তিনটি বহু পুরানো, গল্পের নিচে প্রথম-প্রকাশের স্থান ও তারিখ দেওয়া হয়েছে।

অসময়

এই অসময়ে যে সন্তু-দা ?

সময়-অসময়ের জ্ঞান নেই বাসন্তী। তুমি আসতে বললে, ঘড়ির কাঁটা সেই থেকে যেন অচল হয়ে আছে। একটা ঘণ্টা পার হতে দশ ঘণ্টা করে সময় নিচ্ছে।

ন'টায় আসতে বললাম—

ন'টা আজ বাজবে না বলে মনে হচ্ছে। কখন এসেছি জান ? ঠিক চারটেয়। পার্কে বসে থাকলাম খানিক, সোয়াস্তি পাই নে। পা টনটন করছে বাড়ির সামনে ঘুরে ঘুরে। তারপর 'ত্তোর'— বলে ঢুকে পড়েছি।

মোটেই সময় নেই সন্তু-দা। তোমায় ফিরে যেতে হবে। এখন সিনেমায় যাচ্ছি। আমি, ইলা আর মলয় মিত্তির। সেই যে বি-গ্রুপের মলয় মিত্তির—চিনতে পারছ না ? মলয় টিকিট কিনে রেখেছে মেট্রোর।

না-ই বা গেলে ! কতকাল পরে দেখা !

সে হয় না, কথা দিয়ে ফেলেছি। ন'টার পরে এসো তুমি। নিশ্চয় এসো। কত দিনের কত কথা জমে আছে ! ঐ সময় কেউ থাকবে না—কেউ আসবে না আমার ঘরে। বলে দিয়েছি, শরীর খারাপ—রাত্রে বোর্ডিং-এ খাব না। মলয় মিত্তির—বুঝতেই পারছ—ছবি দেখার পর হোটেলে না খাইয়ে কিছুতে ছাড়বে না।

সন্তোষ বিমর্ষ হল।

মুশকিল! আমার তো ন'টায় আসা শক্ত। মহারাজগঞ্জের প্রিন্স ডিনারে ডেকেছেন। তাঁকে ধ্রুপদ শেখাই। তাঁর টেনিসের পার্টনারও আমি।

কি করছ আজকাল সন্তু-দা?

ক্রিকেটখেলার দরুন সেই যে কাস্টমসে নিয়েছিল—এখন অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সেখানে। মাইনে কুল্যে সাড়ে চার শ'। পোষাচ্ছে না। মহারাজগঞ্জ টানছে ম্যানেজার করবে বলে। ভাবছি, কাস্টমসের চাকরি ছেড়ে দেব। তুমি কি বল?

বাসন্তীর মুখ কালো হয়ে যায়। ইস, এত কদর গান ও খেলাধুলার! বাসন্তী ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আর তিনটে সোনার মেডেল—

হেসে উঠে বলল, চাকরি আদপেই পছন্দ নয় আমার। মলয়ও তাই বলে। আমার ইস্কুলের চাকরি না ছাড়িয়ে সে শুনবে না। কিন্তু স্ত্রী হওয়া—সে-ও এক ধরনের গোলামি। লক্ষপতির ছেলে মলয়—এ বিয়ের সুখশান্তি হয় তো হবে, কিন্তু স্বাধীনতা থাকবে না। কি বল?

হাতঘড়ি দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল বাসন্তী।

সময় হল সিনেমার। কাপড়-চোপড় বদলে একটু ভদ্রস্থ হতে হবে। মলয় মিত্তিরের সঙ্গে যাচ্ছি—বুঝলে না? ওঠ তা হলে সন্তু-দা। ন'টায় এসো। এসো কিন্তু—

আজকে হবে না। ডিনারের নেমন্তন্ন। দেখি, রবিবারে যদি সম্ভব হয়।

বেরিয়ে এসে নিশ্বাস পড়ে সন্তোষের। পোশাকে-প্রসাধনে ঝলমল করছে বাসন্তী। তিরিশ বছর বয়সকে বিশে দাঁড় করিয়েছে।

সজ্জার কৌশলে। এ সাজও পছন্দ নয় তার—সিনেমায় যাবার নূতন বেশ নিতে চলল। মলয় মিত্তিরের মতো ছেলেকে কলের পুতুলের মতো নাচাচ্ছে। মেয়েমানুষ বলেই এত খাতির, এমন সমাদর!

আলাপ জমানোর দরকার বাসন্তীর সঙ্গে। অনেক বড়ঘরের ছেলে চরিয়ে বেড়ায়—বাসন্তীর বন্ধু হিসাবে যদি ভাব করা যায় বড়লোকদের সঙ্গে! কলকাতা ছাড়বার পর সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছে ঐ সমাজে। এখন নূতন করে সংযোগ-স্থাপনার দরকার।

কিন্তু ন'টায় আসা সম্ভব নয় কোনক্রমে। নূতন ট্যুইশানি জুটেছে—ন'টা থেকে দশটা একঘণ্টা গান শেখাতে হবে একটা মেয়েকে। পনের টাকা করে দেবে। সামান্য টাকা—কিন্তু শহরে নিরাশ্রয় এসে দাঁড়িয়েছে, ঐ টাকাই বা দিচ্ছে কে?

সকাল সকাল সে চলল। সাড়ে-আটটায় যদি শুরু করতে পারে, সাড়ে ন'টায় শেষ করে সেই সময় আসবে বাসন্তীর কাছে। তবু সময় থাকবে আধঘণ্টা কথাবার্তার।

ট্রামে যাচ্ছে মেট্রোর সামনে দিয়ে। ঐ আলোকস্মিত ঘরের মধ্যে আনন্দে মসগুল বাসন্তী মলয় মিত্তির ও বান্ধবীদের সঙ্গে ছবি দেখতে এসেছে। যার যেমন অদৃষ্ট!

ছাত্রীর বাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। কর্তা ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, সময় হয় নি তো! আধঘণ্টা আগে এসে পড়েছেন।

সন্তোষ আমতা-আমতা করে বলল, একটু দরকার ছিল। আজকের দিনটা সাড়ে-আটটা থেকে সাড়ে-নটা অবধি থেকে যদি যেতে পারতাম, সুবিধে হত।

কর্তা বললেন, সে হবে কি করে? আর এক মাস্টার পড়াচ্ছেন যে!

অতএব অপেক্ষা করতে লাগল সন্তোষ। টং-টং করে ন'টা বাজতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল শিক্ষক। বাসন্তী। পরনে আধময়লা মিলের শাড়ি, পায়ে ধুলোভরা স্যাণ্ডেল। পোশাক বদলে এসেছে ঠিকই।

কর্তা বললেন, একঘণ্টায় পনের টাকা—তাই আপনি কাঁইকুঁই করছিলেন। জিজ্ঞাসা করে দেখুন এঁকে। দেড় ঘণ্টা পড়ান—সাকুল্যে বারো।

শ্রীবাসুদেবায়

মার্বেল-পাথরের দোকান পরাশরের।

কমলাক্ষ রায় একদিন দোকানে এলেন।

ইয়ে হয়েছে। একটা মার্বেল-স্লাবে সুন্দর করে লিখে দেবে—'শ্রীবাসুদেবায়'।

কিসের জন্য রায় মশায়?

দেউড়িতে বসাব। ঘরবাড়ি আর যাবতীয় ভূসম্পত্তি ঠাকুরের নামে দিয়ে দিচ্ছি। যে ক'টা দিন আছি, স্বামী-স্ত্রী আমরা ঠাকুর-সেবায় কাটিয়ে দেব।

পরাশর পরমোৎসাহে ঘাড় নাড়ে। নশ্বর সংসারে ঠাকুর-সেবার মতো মহৎ কাজ আর কি?

এবং ফরমায়েশ মতো লিখে ফটকের গায়ে বসিয়ে দিয়ে এল সে একদিন। অদূরে মন্দিরের মধ্যে শ্রীমূর্তি প্রসন্ন হাসি হাসছেন।

তিন বছর পরে।

কমলাক্ষ আবার দোকানে এসেছেন। সহিস গাড়ির ছাত থেকে পাথরখানা নামিয়ে এনে রাখল।

খুলে নিয়ে এলাম পরাশর। ঐ সাইজের আর একটা পাথরে লিখে দাও—'নন্দন কানন'। সেইটে বসাব।

আজ্ঞে ?

উৎফুল্ল কণ্ঠে কমলাক্ষ বললেন, ছেলে হয়েছে। গিন্নির বুড়ো বয়সের ছেলে—বুঝতেই পারছ! নাম দিয়েছেন, নন্দদুলাল। ছেলে যখন হয়েছে, ঠাকুরের নামে ঘরবাড়ি দেবার মানে হয় না। ছেলেই বা কি বলবে বড় হয়ে ?

ঘাড় নেড়ে পরাশর সায় দিল। এমন অবিবেচনার কাজ উচিত নয় কোনক্রমে।

ইয়ে হয়েছে। বুধবারে আটকড়াই-ফুটকড়াই। সন্ধ্যাবেলা যেও—কেমন ?

পরাশর বুধবার সন্ধ্যায় গিয়ে আটকড়াই-ফুটকড়াই খেল এবং 'নন্দনকানন' বসিয়ে দিয়ে এল ফটকে।

মন্দিরে শ্রীবাসুদেব প্রসন্ন হাস্যে আশীর্বাদ করছেন নবজাতককে।

কুড়ি বছর পরে।

পলিতকেশ কমলাক্ষ দেখা দিলেন আবার দোকানে। সোফার গাড়ি থেকে পাথরটি নামিয়ে আনল।

এটায় আর চলবে না পরাশর। ইয়ে হয়েছে—নতুন একটা লিখে দাও—'নন্দ-নির্মলা-নিকেতন'।

ভাঙা চশমা নাকের উপর ঠিক করে নিয়ে পরাশর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

ছেলের বিয়ে আঠাশে। লক্ষ্মী মেয়ে—ভারি পছন্দ আমাদের। নাম নির্মলা। আমার যা-কিছু ওদেরই তো হবে! বর-কনে বাড়ি ঢুকবে—তার আগেই মার্বেলটা লাগিয়ে দিতে চাই। নতুন বউ বড্ড খুশি হবে। কেমন মতলব করেছি বলো?

পরাশর মুগ্ধকণ্ঠে স্বীকার করল, নববধূ বাড়ি ঢুকতে গিয়ে নিজের নাম পড়বে—এমন তাজ্জব মতলব ইতিপূর্বে আর কারো মগজে আসেনি।

এরই তিন দিনের দিন কমলাক্ষ আবার এসেছেন। বিপর্যস্ত চেহারা—চোখের কোণে কালি। তিনটে দিনে যেন তিরিশ বছর বুড়িয়ে গেছেন তিনি।

ওহে পরাশর, লিখে ফেলেছ নাকি? আর দরকার হবে না।

কি হল রায় মশায়?

নিশ্বাস ফেলে কমলাক্ষ বলেন, নন্দদুলাল চলে গেছে। শেষ রাতে ওলাউঠা হল, সন্ধ্যার আগেই সব শেষ। শ্রীবাসুদেব পায়ে টেনে নিলেন তাকে। 'নন্দ-নির্মলা' লিখতে হবে না। লেখো 'শ্রীবাসুদেবায়'।

ভাঙাচোরা বাতিল পাথর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল উঠানের প্রান্তে। তার ভিতর থেকে ধূলিমলিন পুরানো একখানা টেনে বের করল।

নতুন আর লিখতে হবে না রায় মশায়। সেইখানাই আছে; ঝেড়ে-ঝুড়ে নিলে চলবে।

ফটকে লাগিয়ে দিয়ে এল। শ্রীবাসুদেব কৌতুকস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

কুণ্ডলা সেনের প্রেমিক

বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্যাচপেচে পথ।

কুণ্ডলা সেন শহর থেকে ফিরছে। ছ'টার গাড়ি ধরতে পারে নি অল্পের জন্য, পরেরটায় এসেছে। স্টেশনে পৌঁচেছে তখন সাড়ে-সাতটা।

মেয়ে-ইস্কুলের চাকরি নিয়ে মাস তিনেক সে এসেছে এই জায়গায়। কাপড়-চোপড় ও কিছু প্রসাধন-সামগ্রী কিনবার জন্য শহরে গিয়েছিল। একজনের কাছে শ'খানেক টাকা ছিল, সেটাও আদায় করে নিয়ে এসেছে। আরও টুকিটাকি কাজ ছিল। নানা কাজে দেরি হয়ে গেল।

পাড়াগাঁ জায়গা। দিনকাল ভাল নয়, লোকের অভাব-অভিযোগের অন্ত নেই। পথ-ঘাট নির্জন। ইস্কুলও মাইলখানেক হবে স্টেশন থেকে। এইজন্য বেলাবেলি আসতে চেয়েছিল কুণ্ডলা। কিন্তু ঘটে উঠল না।

তাই হনহন করে পথ অতিক্রম করছিল দেহভারে ধরণী প্রকম্পিত করে।

স্টেশন থেকেই মনে হয়েছিল, কে-একজন পিছু নিয়েছে। গোড়ায় আমল দেয় নি। কেউ কোন কাজে চলেছে—সম্ভবত বামুনপাড়ার দিকে চলেছে, এগিয়ে ডানহাতি মোড় ঘুরবে।

কিন্তু বামুনপাড়ার মোড় চলে গেল। লোকটা নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ করে চলেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল কুণ্ডলা সেনের। পাড়াটা ছাড়িয়েই দু-ধারে বাঁশবন। ঘন-সন্নিবিষ্ট। দিনমানেই আঁধার হয়ে থাকে। ঐখানে কাজ হাসিল করবার মতলব নাকি লোকটার? অতএব পাড়ার সীমানা পার না হতেই হেস্তনেস্ত করা আবশ্যক।

সুঁড়িপথে সে নেমে পড়ল। হরিশ গরাই-এর বাড়ি অদূরে। মেয়ে-ইস্কুলের বেয়ারা হরিশ—ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার মশায়ের বাড়ির চাকরও। চার ভাই তারা—সবাই এক একটা দৈত্য। এখানে যদি লোকটা বজ্জাতি করতে আসে, পরম দুর্গতি আছে তার অদৃষ্টে।

ঐ তো! কুণ্ডলা দ্রুতপায়ে খানিকটা এগিয়ে কাঁঠালগাছের আড়ালে দাঁড়াল। এসে পড়ল লোকটা। কুণ্ডলা সহসা পিছন থেকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, দাঁড়াও—কে তুমি?

টর্চ ফেলল তার মুখে। আলোয় মুখ দেখে বিস্মিত হল। ফার্স্ট ক্লাস-কামরা থেকে নেমে এই ছোকরাই সতৃষ্ণ চোখে বারম্বার তাকাচ্ছিল তার দিকে। সুদর্শন চেহারা।

কোথায় যাবেন আপনি?

দীপ্তিনারায়ণ মজুমদারের বাড়ি।

চালাকির জায়গা পান না? মজুমদার-বাড়ি যেতে এদিকে আসবেন কেন?

ছোকরা নিরুত্তর থাকে। কুণ্ডলা পুনশ্চ প্রশ্ন করে, মজুমদার মশায় আপনার কে হন?

বাবা—

সবিস্ময়ে কুণ্ডলা বলে, আপনিই তবে—

আমার নাম শ্রীতৃপ্তিনারায়ণ মজুমদার। আবার টর্চ ফেলতে হয়, ভাল করে দেখতে হবে। কুণ্ডলা এসে অবধি তৃপ্তির গুণগান শুনছে।

কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস-ফার্স্ট হয়ে নামজাদা অধ্যাপকের কাছে সাকরেদি করছে। স্বভাব-চরিত্রও যুবজনের দৃষ্টান্তস্বরূপ—সিগারেটটি অবধি খায় না।

কুণ্ডলা কোমল কণ্ঠে (তার পক্ষে কণ্ঠস্বর যতদূর কোমল করা সম্ভব) আহ্বান করল, আসুন—

তৃপ্তিনারায়ণ যেন এরই প্রতীক্ষা করছিল। বিনাবাক্যে সঙ্গে চলল। কোয়ার্টারে পৌঁছে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কুণ্ডলা একদৃষ্টিতে তাকাল আবার তৃপ্তির দিকে।

আচ্ছা, সত্যি করে বলুন। বাঁশবন পার হয়ে গেলেই তো আপনাদের বাড়ি। সোজা না গিয়ে আমার পিছু নিয়ে এতটা পথ ঘুরলেন কেন?

তৃপ্তি আমতা-আমতা করে।

কুণ্ডলা সাহস দিচ্ছে, বলুন, বলুন না—

কিন্তু কিছুই বলতে পারে না সে। ঘেমে উঠছে। সুন্দর মুখের বিহ্বল অপ্রতিভ ভাব কুণ্ডলা পরম কৌতুকে উপভোগ করছে।

মানে···ইয়ে হল কিনা—

কুণ্ডলা বলে, বুঝতে পেরেছি। থাক।

তৃপ্তিনারায়ণ মুখ তুলতে পারে না, মাটির দিকে চেয়ে থাকে। কুণ্ডলা হাত ধরে বসাল। চা করে খেল দু'জনে।

অনেকক্ষণ পরে সঙ্কুচিত ভাবে তৃপ্তি বলে, ওঠা যাক—

ঘড়ি দেখে কুণ্ডলা চমকে ওঠে, ইস—দশটা বেজে গেছে।

চলে যাচ্ছি তা হলে—

অতি কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তৃপ্তি। যাবে, কিন্তু পা কিছুতে উঠছে না যেন তার। নিশ্বাস ফেলল সে কুণ্ডলার দিকে তাকিয়ে।

বিমোহিত কুণ্ডলা সেন।

চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি খানিকটা।

একটু থেমে বলে, আপনিও কিন্তু আবার পৌঁছে দিয়ে যাবেন। নইলে একা-একা ফিরে আসব কেমন করে?

খিল-খিল করে অজস্র হাসি হেসে উঠল কুণ্ডলা। এমন হাসি হাসতে পারে, সে জানত না। তৃপ্তিনারায়ণও হাসে।

কুণ্ডলা বলে, এবারে আমি পৌঁছতে যাব। তারপর আপনি পৌঁছে দিয়ে যাবেন। সারারাত্রি এমনি চলবে। কেমন?

বেরুল দু-জনে। যাবার আগে কুণ্ডলা সেন আয়নায় একনজর মুখ দেখে আসে। থপথপে শরীর নিয়ে এত দ্রুত ছুটতে পারে সে! মুখটাও যেন রোগা-রোগা দেখাল। এবং মুখের উপর ঔজ্জ্বল্য।

গুন-গুন করে কি বলছে কুণ্ডলা। মনের আনন্দে বকে যাচ্ছে। বাঁশতলা ঘনান্ধকার। তৃপ্তিনারায়ণ তার হাত ধরল। কুণ্ডলা আপত্তি করে না। সাহস পেয়ে হাত ধরে তৃপ্তি পাশে পাশে চলেছে। অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে তারা।

আপনাদের বাড়ির আলো—ঐ যে! জানেন না, আপনাদের ইস্কুলের কাজ নিয়ে এসেছি আমি।…ফিরে চলুন, এবার আমায় পৌঁছে দেবেন। যা কথা ছিল।

কিন্তু অদ্ভুত আচরণ তৃপ্তিনারায়ণের। কুণ্ডলার হাত ঝটকা মেরে সরিয়ে সে ছুটল। এক দৌড়ে ফটকের সামনে। বিষম জোরে কড়া নাড়ছে। দরজা খুলে যেতেই ঢুকে পড়ল। পিছনে তাকিয়ে দেখল না একটিবার।

কুণ্ডলা হতভম্ব হয়ে অন্ধকারে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপার কতকটা আন্দাজ করেছে। বাড়ির কেউ দেখে ফেলবে—এই আশঙ্কায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল সে। কিন্তু এটা উচিত নয়। বড়লোক এবং চাকরি-দাতার পুত্র হলেও এত বাড়াবাড়ি সহ্য করা শক্ত কুণ্ডলার পক্ষে।

পর দিন ভোরবেলা কুণ্ডলা সেন মজুমদার-বাড়ি এল। দীপ্তি-নারায়ণের সঙ্গে দরকার ইস্কুল সম্পর্কে—কিন্তু কর্তা অনেক বেলায় শয্যাত্যাগ করেন, এটা সকলের জানা।

হরিশকে কুণ্ডলা প্রশ্ন করে, তৃপ্তি বাবু এসেছেন নাকি শুনলাম ?

হরিশ বলে, তিনি অনেকক্ষণ উঠেছেন। পড়াশুনা করছেন।

কোথায় ?

হরিশ দোতলার বৈঠকখানা দেখিয়ে দিল। দিয়ে কাজে চলে গেল।

কুণ্ডলা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। কেউ নেই কোথাও। টিপিটিপি পিছনে এসে সে তৃপ্তির হাতের বই কেড়ে নিল।

হুলস্থুল ব্যাপার ! আর্তনাদ করে তৃপ্তিনারায়ণ ছুটল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল পাঁচ-সাতটা ধাপের নিচে। বাড়ির সবাই ছুটে এল।

চিৎকারের অনুপাতে আঘাত কিছুই নয়। তৃপ্তির বোন আশা কুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবার কাছে এসেছেন বুঝি ? ডেকে তুলব ?

প্রতিহিংসাপর কুণ্ডলা তৃপ্তিকে দেখিয়ে বলে, না—এসেছি ওঁর কাছে। কাল আমার বাসায় রুমাল ফেলে এসেছিলেন, সেইটে দিতে এসেছি।

দাদা আপনাব বাসায় গিয়েছিলেন ?

তৃপ্তির অঞ্চলব্যাপ্ত গৌরব ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়ে কুণ্ডলা বলে, হ্যাঁ—স্টেশন থেকে পিছু নিলেন, চা-টা খেলেন আমার বাসায়। তারপরেও ছাড়লেন না, সঙ্গে টেনে নিয়ে এলেন এই অবধি।

আশা হাততালি দিয়ে বলে, তাই বলুন। দাদা দেমাক করেন, একলা বাঁশতলা পার হয়ে এসেছেন। সে কি বিশ্বাস হবার কথা ?

কেন ?

দাদার বড্ড ভূতের ভয় রাত্রিবেলা—

হরিশ বলে; দিনমানেও। সকালবেলা কি কাণ্ডটা করলেন, দেখতে পেলেন তো ?

ইস্কুলের বেয়ারা হরিশকে রোজ পাঁচ-সাত ঘণ্টা কাটাতে হয় কুণ্ডলা সেনের কাছাকাছি।

দুই জানলা

পুরীর এক হোটেলে গিয়ে উঠেছে। ঘরটি নিরিবিলি এবং অতিশয় ছোট—কায়ক্লেশে একটা সরু খাট পড়েছে। তা হোক—এই যথেষ্ট। সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গাই কাম্য তাদের। ছুটিতে আছে কিম্বা নেই—কারো নজরে পড়বে না। খাট না হলে বা কি—মেজেতেও শুতে রাজি। এক হাত জায়গার মধ্যে পরম ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবে। সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলেই ব্যস, আর কোন ঝামেলা নেই—নিশ্চিন্ত মুখোমুখি বসে দেদার ভবিষ্যতের ছবি আঁকো। চাকরটাকে মোটা বখশিশ কবুল করেছে ভাত ও চা-জলখাবার ঘরে দিয়ে যাবার জন্য। খাওয়ার টেবিলে অনেকে বসে বসে আড্ডা জমায়, গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসে। এ সমস্ত নিরতিশয় বিরক্তিকর এদের কাছে।

ঘরে দুটো জানলা—এ-জানলায় সমুদ্র, ও-জানলায় শহর। দু-জনে দু-জানলায় গিয়ে বসে অনেক সময়। মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা চলে।

পার নেই, তল নেই—কি বিরাট সমুদ্র! নুনিয়ার নৌকোগুলো দেখ, দেখ—কেমন যাচ্ছে ঢেউয়ের উপর দিয়ে!

অপর জানলা থেকে বলে, তোফা তোফা বাড়ি এদিকে। লোকজন নেই—খালি বাড়ি নাকি ?

তালা দেওয়া আছে। মালিকরা ছুটিছাটায় এসে তালা খোলে বছরে এক-আধবার।

ঢুকে পড়া যাক ওর একটায়—

সমুদ্রমুখো জানলা থেকে প্রতিবাদ আসে, ইঁদুরের মতো তোমার খালি গর্তে ঢুকে পড়ার ঝোঁক। ঢেউ খেতে খেতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলো দু-জন দূরদূরান্তে চলে যাই।

গল্পকর্তা অবিনাশ একটা সিগারেট ধরিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, কথাবার্তাগুলো কিম্বা এই জানলায় বসবার বৃত্তান্ত অবশ্য আনুমানিক। কিন্তু হলপ করে বলতে পারি, ঐ ধরনেরই ফিসফিস-গুজগুজ চলত ওদের মধ্যে।

কাদের কথা বলছেন?

বাঁকাচোখে তাকিয়ে অবিনাশ বললেন, আন্দাজ করো না—

নিশ্চয় আমাদের মিনি আর তরুণ। পালিয়ে বিয়ে করে কোন হোটেলে উঠেছিল না তারা?

অবিনাশ দারোগা হেসে ঘাড় নাড়লেন।

সমুদ্র পাড়ি দেবার জোগাড়ে ছিল অমলকান্তি—আই. সি. এস. অমলকান্তি হে—লড়ায়ের বাজারে সরকারি সাড়ে তিন লাখ টাকা মেরে এখন যে শ্রীঘরে বাস করছে। আর শহরের খালি বাড়ি যার মন টানছিল, তার নাম কাসেম আলি—স্বনামধন্য সিঁধেল।

একমুখ ধূম উদ্গীরণ করে অবিনাশ বলতে লাগলেন, কলকাতায় সে সময়টা ভীষণ দাঙ্গা। তারই মধ্যে এরা হিন্দু-মুশলিম ঐক্যের তাজ্জব নিদর্শন দেখিয়ে দিল। হোটেলের ঘরে এক বালিশ মাথায় এক সতরঞ্চিতে শয়ান দু-জনকে আমি গ্রেপ্তার করি।

নতুন গল্প

ভদ্রলোক উপরওয়ালার ঘরে গেলেন। মহাব্যস্ত তখন উপর-ওয়ালা। একটা ফাইল নিয়ে তার উপর নীল পেন্সিলে কি সব মন্তব্য করছিলেন নিবিষ্ট হয়ে। সামনের চেয়ারটা সশব্দে একটুখানি সরিয়ে ভদ্রলোক বসে পড়লেন। চোখ তুললেন এবার উপরওয়ালা। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কি ?

ছুটি চাই—অন্ততপক্ষে তিনটে দিনের।

এখন হতে পারে না। কাজের অত্যন্ত চাপাচাপি। দরখাস্ত নামঞ্জুর করবার সময় লিখে দিয়েছে তো সে কথা।

তাই আর একটা দরখাস্ত নিয়ে এলাম—

দরখাস্তটা মেলে ভদ্রলোক ফাইলের উপরে রাখলেন। অতএব না পড়ে উপায় নেই। কাজের ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে উপরওয়ালা বাঁকা চোখে পড়তে লাগলেন। প্রথমটা অবহেলা ভরে পড়ছিলেন, তারপর হাতে তুলে নিলেন কাগজখানা।

পদত্যাগ-পত্র। দেশে যেতেই হবে—ছুটি দেওয়া যদি সম্ভবপর না হয়, কর্তৃপক্ষ এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে যেন বাধিত করেন।

উপরওয়ালা সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক একনজর দেখে নিলেন। মাথা খারাপ হল নাকি এঁর ? বললেন, চাকরির চেয়ে ভাইয়ের বিয়ের আমোদ-স্ফূর্তি বড় হল আপনার কাছে ?

মা লিখেছেন যাবার জন্য। না গেলে দুঃখ পাবেন। চাকরি যায় যাক—মায়ের হুকুম অমান্য করতে পারব না।

এ বাজারে আড়াই শ' টাকার চাকরিটা যাচ্ছে। ভেবে-চিন্তে দেখুন ভাল করে।

দশটা থেকে তিনটে—এই পাঁচ ঘণ্টা ধরেই ভাবলাম। দু-বেলা খাচ্ছিলাম—চাকরি গেলে না হয় দু-দিন অন্তর খাব।

বেশ!

উপরওয়ালা খস-খস করে হুকুম দিলেন দরখাস্তের উপর। ভদ্রলোক দেখলেন—লিখেছেন, ছুটি মঞ্জুর, পদত্যাগ গৃহীত হল না। ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য।

আপনার মতো মানুষ দুর্লভ আজকালকার দিনে। আপনার মাতৃভক্তি ও তেজস্বিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় আর নেই। সাড়ে তিনটা বাজে দেয়াল-ঘড়িতে। তিনটে-বাইশের গাড়ি ধরতে পারলে বড় সুবিধা হত, সেটা গ্রামের স্টেশনে ধরে। এখন সাড়ে-পাঁচটার মেল ছাড়া গতি নেই। সেটা গ্রাম অতিক্রম করে পাঁচ মাইল দূরের জংশন-স্টেশনে থামবে রাত্রি দশটায়। পাঁচ মাইল বেশি কিছু নয়—তবে রাত্রিবেলা, আর এই বর্ষাকালের পথঘাট। পোঁটলা-পুটলি বেঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার দরকার—সাড়ে-পাঁচটার গাড়ি ফসকে না যায় কোনক্রমে।

জংশন-স্টেশনে গাড়ি থামল, বৃষ্টিও নামল মুষলধারে। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে চারিদিক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

স্টেশন-মাস্টার সুপরিচিত। তিনি বললেন, এই অভদ্রার মধ্যে যাবেন না। যা হোক দুটো ডাল-ভাত খেয়ে আমার বাসায় শুয়ে থাকুন।

কিন্তু শুনলেন না ভদ্রলোক। এত হাঙ্গামা-হুজ্জুতের পর বাড়ির কাছাকাছি এসে আটকে থাকবেন, সে হতে পারে না কিছুতে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, তবু ছাতা বন্ধ করে চলেছেন। জোর বাতাসে ছাতা খোলা চলে না। তা ছাড়া বন্ধ ছাতা লাঠির মতো ঠুকে ঠুকে পথের আন্দাজ নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—এই একটু সুবিধা। অনেকবার আছাড় খেয়ে জলকাদা ভেঙে অনেক দুঃখে পথ এগোচ্ছেন।

কিন্তু বিপদের যেন শেষ নেই। বিদ্যুতের আলোয় নদীর অবস্থা দেখে বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। কূলপ্লাবী স্রোতোধারায় বাঁশের সাঁকো ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভাবলেন তিনি। তারপর 'জয় মা গঙ্গা'—বলে অকুতোভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন!

ভিজে কাপড়চোপড়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিলেন।

কই গো—

সম্পাদক রোষদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, এ কি মশায়? নতুন গল্প দেবার কথা—

লেখক বললেন, নতুনই তো—

আমাদের পড়াশুনো নেই, এই বুঝি মনে করেন? এ তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা—আধুনিক ঢঙে লিখে এনেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নয়, ভদ্রলোকের নাম চন্দ্রনাথ শিকদার। চাঁদাবাবু বলে সকলে।

নাম আলাদা হোক, ঘটনা হুবহু এক। ছোট ভাইয়ের বিয়েয় আসা মায়ের চিঠি পেয়ে—

আজ্ঞে না। মা মরেছিলেন চাঁদাবাবুর আট মাস বয়সে। আর ছোট-বড় মাসতুতো-মামাতুতো কোন রকম ভাই নেই তাঁর! শেষটা শুনুন—

চাঁদাবাবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, কই গো, কোথায় সব? আমি এসেছি—

কে?

আমি, আমি গো! গলা শুনে চিনতে পার না, কেমন—

কথা অসমাপ্ত রইল। গর্জন উঠল ভিতর থেকে।

আবার এসেছ দু-হপ্তা না যেতে? খুলব না দরজা।

কি করব? ব্যস্ত কর কেন চিঠি লিখে? দাঁতের যন্ত্রণার কথা লিখলে মানুষ উতলা হয় না?

ভিতর থেকে মন্তব্য আসে, বাবা কত কষ্টে জুটিয়ে দিলেন। তা এমন ঘন ঘন বাড়ি আসা—চাকরি ক'দিন টিকবে?

ঠায় দাঁড়িয়ে জলে ভিজছি। নিউমোনিয়া ধরবে এক্ষুণি। দরজা খোল লক্ষ্মীটি—

অনেক খোশামুদির পর বউ দরজা খুলল।

ইস্, কি কাণ্ড বল তো! এ অবস্থায় কুকুর-শিয়ালে বেরোয় না। বেঘোরে মারা পড়বে তুমি কোন দিন।

একগাল হেসে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে চন্দ্রনাথ বলে, তোমার বাবা চাকরি করে দিলেন, যেমন-তেমন একটা বাসা জুটিয়ে দিতে বল এবার। বেঘোরে মরব না, চাকরিও ঠিক থাকবে, নতুন গল্প বানানোর জন্য মাথা খুড়তে হবে না হপ্তায় হপ্তায়—

ছবি

চাকরি পেয়ে প্রথমটা খুব স্ফূর্তি হয়েছিল অবনীর। খাটুনি কিছুই নয়, কুড়ি-বাইশখানা বাড়ি আছে—তার ভাড়া আদায় করা। মাসের গোড়ার দিকে হপ্তাখানেকের কাজ মোটে—বাকি দিনগুলো শুয়ে বসে কাটানো।

কিন্তু স্ফূর্তি উবে গেল মাসখানেকের মধ্যে। প্রকাণ্ড বাড়ি, আটখানা ঘর পাশাপাশি, তার মধ্যে দু-জন মাত্র—সে আর গিন্নি-ঠাকরুন ক্ষীরোদা। ঠাকুর-চাকর পারতপক্ষে এদিকে ঘেঁষে না, তারা রান্নাঘরে থাকে। অবনীও পরমানন্দে রাজি আছে তাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে থাকতে, কিন্তু তার বেলা আদেশ মিলবে না। কড়া রাশভারি মানুষ ক্ষীরোদা, ছেলেপুলে নেই। ত্রিসংসারে কেউ যে আছে, অবস্থা দেখে মনে হয় না।

অতিকায় আট-আটটা ঘর হাঁ করে রয়েছে, অবনীকে গালের মধ্যে পুরে দিন-রাত্রি ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করছে—এমনি একটা আতঙ্ক অহরহ মন জুড়ে রয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, কাজ পেলে সে বেঁচে যেত—কাজের ভিড়ে ভুলে থাকতে পারত। ক্ষীরোদার হুকুম, কখন কি দরকার পড়ে—চব্বিশ ঘণ্টা তাকে হাজির থাকতে হবে বাড়িতে। খাবে-দাবে, কাজ না থাকলে বই-টই পড়বে, ইচ্ছা হলে চাই কি—গান-বাজনাও করতে পারবে—তাতে তাঁর আপত্তি নেই। গানে কিছু শখও আছে অবনীর। বাজনার জিনিস অবশ্য সিংহমুখো যে খাটখানায় সে শোয় সেইটে ছাড়া আর কিছু নেই। ঠেকা দিয়ে তাতেই চালানো যেত—কিন্তু কথা বলতে গেলেই ঘরের

মধ্যে গম-গম করে ওঠে, এর উপর গান গাইতে তার ভরসায় কুলিয়ে ওঠে না। আর বইয়ের মধ্যে এ-বাড়িতে আছে শুধু পঞ্জিকা। ক্ষীরোদা সারাক্ষণ তাঁর ঘরখানির মধ্যে থাকেন, কি করেন তিনিই জানেন। ত্বপুরবেলা স্নানের সময়টা বেরিয়ে আসেন একবার। আর বেরোন যখন কোন কাজের দরকার পড়ে। ভাঁটার মতো চোখের মণি ঘুরিয়ে এমন করে তাকান যে অবনীর বুকের মধ্যে গুরু-গুর করে ওঠে। কথা বলেন—বাইরের কেউ শুনলে মনে করবে, ঝগড়া করছেন। গলার স্বরই ঐ রকম। ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব মোলায়েম স্বরে একদিন বললেন, একা-একা কষ্ট হচ্ছে—না? মাঝে মাঝে আমার ঘরে গিয়ে গল্পগুজব করলে তো পার।

বাবা রে—সামনে দাঁড়াতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে, গল্পগুজব এই মানুষের সঙ্গে!

একটা জিনিস অবনী পেয়ে গেল হঠাৎ। পেয়ে যেন বেঁচে গেল। একটি মেয়ের ছবি। ঐ আটটা ঘরেরই একটায় এক-কোণে টাঙানো ছিল। ছবিটা চুরি করে এনে সে বিছানার ভিতর রাখল। ফাঁক পেলেই বের করে দেখে। দেখে আশ মেটে না। মরুভূমির মতো বাড়িটা—তার মধ্যে একমুঠো যুঁইফুল।

একলাটি অন্ধকারে গা ছম-ছম করে, তাই ঘুম না আসা অবধি শিয়রে আলো জ্বেলে রাখে অবনী। এখন আর একলা মনে হয় না—পাশে ছবিখানা। ছবি নয়, ফুটফুটে এক তরুণী। লাবণ্য মুখের উপর ঢল-ঢল করছে। ঘুম-ভরা চোখে মনে হয়, জাগ্রত প্রাণচঞ্চল মেয়েটি শান্ত হয়ে পাশে শুয়ে আছে। একের মন যেন জড়িয়ে ধরে আছে অন্যকে। নিবিড় আলিঙ্গনে সহসা সে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ছাড়ো গো, ছাড়ো—আহা, লাগে—

মট-মট করে ওঠে—তখনই সম্বিৎ হয়, মানুষ নয়—ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যে ওটা!

সকালবেলা শান্ত মুহূর্তে অবনীর ভাবনা জাগে, এ কি নূতন উৎপাত শুরু হল আবার! নির্জন এই প্রাচীন পুরীতে কবে মূর্তিমতী ছিল ঐ তরুণী! খিল-খিল করে হাসত, ধুপধাপ ছুটে বেড়াত সারা বাড়ি, গুনগুনিয়ে গান গাইত জ্যোৎস্না-রাত্রে। সেই গান-হাসি রাত্রি হলেই ভেসে বেড়ায় যেন ঘরের মধ্যে। ফ্রেমের ছবি থেকে বেরিয়ে এসে সারা রাত সে পাশটিতে শুয়ে নিঃশব্দ ভাষায় মধুগুঞ্জন করে। টং-টং করে ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যায়, রাত শেষ হয়ে আসে, কথার তবু যেন শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যা পড়েছে, সেই রকম। গল্প সত্যি হয়ে ঘটছে তার জীবনে।

অনেক রাত্রে ক্ষীরোদা দুয়ার খুলে বারান্দা অতিক্রম করে চললেন অবনীর ঘরের দিকে। এসে জানলায় ঘা দিলেন।

ঘুমিয়েছ না কি?

সাড়া না পেয়ে জোরে জোরে ঘা দিতে লাগলেন। অবনী ফুঁ দিয়ে তাড়াতাড়ি আলো নেবাল।

ক্ষীরোদা বললেন, আলো ছিল—দেখতে পেয়েছি। রাত কত এখন?

সাড়ে-দশটা হবে আজ্ঞে—

সাড়ে-দশটা ছিল দু-ঘণ্টা আগে।

তাই না কি? টের পাই নি তো—

কি করে পাবে? কোরাসিনের খরচ তো তোমায় যোগাতে হয় না। এমন করে জানলা এঁটেছ, তবু আলো বেরুচ্ছিল। নবেল পড়া হচ্ছে?

আজ্ঞে না। নবেল কোথা পাব?

তা হলে ভগবদ্গীতা? যা খুশি পড়তে পার—কিন্তু দিনমানে পড়বে। লজ্জা করে না পরের পয়সায় কেরোসিন পোড়াতে?

অবনী চুপ করে থাকে। কিন্তু গ্রহ কাটে নি। ক্ষীরোদা বললেন, দুয়োর খোল—

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে তিনি এসে দাঁড়ালেন। অবনী ঘেমে উঠেছে। কি সর্বনাশ হয়, কি না জানি করে বসেন এই নির্জন নিশিরাত্রে এইবার!

হুকুম হল, আলো জ্বালো—

ছবিটা কাপড়ের মধ্যে ঢেকে অবনী আলো জ্বালল। বাঁচোয়া, যা ভেবেছিল সে সব নয়। খেরো-বাঁধা জমাখরচের খাতা ক্ষীরোদার হাতে। এত রাত অবধি হিসাব নিয়ে ছিলেন তা হলে তিনি! কঠোর কণ্ঠে বললেন, যোগটা দেখ—

আজ্ঞে—

একশ' সতের করেছ, একশ' উনিশ হবে। দেখ—

থতমত খেয়ে অবনী বলে, তাই তো—ভুল হয়ে গেছে।

তুমি ইচ্ছে করে করেছ। জোচ্চুরি করে মেরে দিয়েছ আমার দুটো টাকা। ভেবেছিলে, ধরতে পারবে না। মিথ্যে বলে এখন ঢাকতে যাচ্ছ। উঁ?

অবনীর ছাতাটা হাতে তুলে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়ালেন।

পিঠের ছাল তুলে নেব, আমায় চেনো না। তোমার মতো পাঁচ-সাতটা এর আগে ঘায়েল হয়েছে এ-বাড়িতে।

অবনী তড়াক করে উঠে পালাতে যায়। কাপড়ের ভিতর থেকে ছবি মেজেয় পড়ল।

ক্ষীরোদা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এখানে আমার ছবি ?

আপনার ছিল এ ছবি ?

এ অবস্থার মধ্যেও অবনী একবার ছবির দিকে একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

দেয়ালে টাঙানো ছিল। ছবি চুরি করে এনেছ তুমি শয়তান।

রাগ সামলাতে না পেরে ক্ষীরোদা ছাতার বাঁট দিয়ে অবনীর পিঠে বসিয়ে দিলেন এক ঘা।

ছুটে পালাচ্ছে অবনী। ঠোক্কর লেগে ছবি বারান্দায় পড়ল, ঝনঝনিয়ে কাচ চুরমার হয়ে গেল। ক্ষীরোদা তাড়া করেছেন। পায়ের আঘাতে ছবি বারান্দা থেকে পড়ল উঠানের নর্দামায়।

বাতুলাশ্রম

ভাইঝির কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল। ভেবে চিন্তে বাতুলাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য প্যারিমোহন সুরের সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে অল্প-সল্প পরিচয় ছিল। তা ছাড়া, আমি খবরের কাগজে লিখি—সেটা জানতেন তিনি। প্রয়োজনের কথা বলতে তিনি বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

দেখেন তো! এই আবার জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন ? আশ্রম তো আপনাদেরই জন্যে। জায়গা না থাকলেও দিতে হবে জায়গা করে। দেখেন তো…ক'টা জায়গা চাই ? আপনার বাড়িসুদ্ধ ঢুকিয়ে নিতে পারি যদি আদেশ করেন।

পরম আপ্যায়ন করলেন তিনি।

বললাম, নিজের চোখে দেখে আসতে চাই একবার। স্ত্রী বলছেন রাঁচির কথা। কিন্তু কাছাকাছি যদি হয়ে যায়—

রাঁচির প্রসঙ্গে প্যারিমোহন খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

এই দেখেন। বিহারের কাছে কোন্ দুঃখে হাতজোড় করে জায়গা চাইতে যাব? কিসে কম যাচ্ছি বাঙালি আমরা?

হেসে বললাম, বাতুলের ব্যাপারে তো নই-ই।

কোন ব্যাপারেই নই। আচ্ছা, দেখে আসুনগে আশ্রম। তাজ্জব হয়ে যাবেন। আগে কিছু বলছি না—

আবার বললেন, দাঁড়ান। সুদর্শন ডাক্তারের নামে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।

চিঠিতে আমার গুণপনা ফলাও করে লিখলেন। এত গুণের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি জানতে পেরে চমক লাগল।

শহরের বাইরে আম-কাঁঠালের ছায়াচ্ছন্ন নিরালা জায়গাটা। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা—পাগলেরা বেরিয়ে যেতে না পারে! গেটের পাশে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোয়ার্টার।

শুনলাম, সুদর্শন ডাক্তার রোগি দেখছেন এ সময়টা। কেরানি ভদ্রলোক বলে দিলেন, সোজা চলে যান কাঁকরের রাস্তা বেয়ে। ডাক্তারবাবু অতি ভদ্রলোক—যা জিজ্ঞাস্য থাকে, ভাল করে জেনে নেবেন।

অতএব এগিয়ে চলেছি।

লম্বা-চওড়া ফর্সা চেহারার প্রবীণ এক ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন। চোখাচোখি হতে এক গাল হেসে বললেন, পাগল দেখতে এসেছেন? আসুন।

পরম ভদ্র সত্যিই। সুদর্শন নাম—চেহারাতেই প্রকাশ পাচ্ছে। বাঙালির মধ্যে এমন সুপুরুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে চললেন। চিঠি দেখাতে যাচ্ছিলাম—বললেন, থাক—থাক—কিছু দরকার নেই।

ঝিলের ধার দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে নিয়ে চলেছেন। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন।

ঐ একটা। কি মজা করছে, দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন না? বেঞ্চিতে বসে ঐ যে—

পিছনটায় ঝিল, সামনে কলাঝাড়—সহজে নজর পড়ে না। জায়গা বেছে নিয়েছে চমৎকার। বেঢপ-মোটা কুৎসিত-দর্শন একটা মেয়ের হাত জড়িয়ে ধরেছে—পাগলই নিঃসন্দেহ। ঐ আকৃতির মেয়ের কাছে প্রেম-নিবেদন করতে পারে না কেউ সুস্থ সজ্ঞান অবস্থায়।

দেখছেন?

পরেও ছিল দেখবার। মেয়েটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে থাপ্পড় কষে দিল লোকটার গালে। থাপ্পড়ে রাগ মেটে নি—অতঃপর ঘুসি ঝাড়ছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের প্রবীণটি তিড়িং করে তুড়িলাফ দিলেন।

পাগলের পাগলামি দেখুন মশায়। হি-হি-হি। হো-হো-হো।

হাসি ক্রমশ বাড়ছে আর নৃত্যও উদ্দাম হচ্ছে তদনুপাতে। আমি অবাক। এতক্ষণের সংযত গাম্ভীর্য ছিন্ন পোশাকের মতো ভদ্রলোক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

চপেটাঘাত-প্রাপ্ত লোকটা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, রাসু দে এল কি করে?···কে আছিস, রাসু দে শিকল খুলে বেরিয়ে এসেছে।

ভৃত্যশ্রেণীর জন দুই ছুটে এসে আমার সঙ্গী ভদ্রলোককে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

লোকটি অতঃপর আমার দিকে কটমট চোখে চেয়ে বলল, কে আপনি ? আশ্রমে ঢুকলেন কি করে ? কেউ কিছু বলল না ?

চিঠিটা দিলাম।

আমিই মশায়। আমার নাম সুদর্শন রায়।

সসম্ভ্রমে বলে, প্যারিবাবুর বন্ধু আপনি ? তা আসুন আমাব সঙ্গে—

কিন্তু যাওয়া হল না। পরীর মতো এক তরুণী বধূ এসে উপস্থিত সেই মুহূর্তে।

অভিমানাহত কণ্ঠে বধূ বলে, পাঁচটা বাজল। সিনেমার টিকিট করে এনেছে। তুমি সমস্ত ভুলে বসে আছ।

সুদর্শন বলল, কি করি বলো সবিতা ! কাজেব চাপ। আবার এই ভদ্রলোক আশ্রম দেখতে এসেছেন। প্যারিবাবুব বন্ধু।··· দেখবাব কি-ই বা আছে—পাগল-টাগল দেখিয়ে দিই দু-পাঁচটা।

বললাম, দেখা আমার:হয়ে গেছে। আপনাবা সিনেমায় যান।

দূব হতে:দেখতে পাচ্ছি, সুদর্শন একটা হাত দিয়েছে সবিতার কাঁধে। মৃদুকণ্ঠে কি বলতে বলতে যাচ্ছে দু-জনে, ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে। পৃথিবীতে এমন সুখী দম্পতি বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই।

ঘড়ি-চুরি

ঘাড় হারিয়েছে ডাক্তার প্রফুল্ল সরকারের। দামি টেঁক-ঘড়ি। ডাক্তার সরকার সম্প্রতি এখানকার সরকারি ডাক্তারখানায় বদলি হয়ে এসেছেন। নরোত্তম তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

নরোত্তম অত্যন্ত মিশুক মহাশয় ব্যক্তি। বুড়া বয়সে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ইদানীং পতঞ্জলি-দর্শন নিয়ে মেতে আছেন। এখানকার আদিতম বাসিন্দা—সেজন্য এক ধরনের গর্ব আছে মনে মনে। যে কোন বিশিষ্ট লোক এ শহরে আসেন, নরোত্তম তাঁকে বাড়িতে ডেকে আপ্যায়ন করে থাকেন। এটা তাঁর চিরকালের রীতি।

প্রফুল্ল ছাড়াও নিমন্ত্রিত হয়েছেন ছোট-দারোগা শৈলবিহারী, পাটবাবু অজয় এবং পরমেশ। পরমেশের পরিচয় এক কথায় দেওয়া চলে না। পূর্ববঙ্গে কোথাকার জমিদার তারা, রাজা উপাধি ছিল নাকি একসময়ে পূর্বপুরুষদের। সম্প্রতি দেশ স্বাধীন হওয়ার দরুন উদ্বাস্তু হয়ে এইখানে ডাকবাংলোয় এসে উঠেছে—ব্যবসাপত্রের সুবিধা হয় কিনা খোঁজখবর নিচ্ছে। সে সুবিধা কোনদিনই হবার সম্ভাবনা নেই—মিহি-গলা অতিশয় ক্ষীণ-প্রাণ মানুষটি, পোশাক ও চালচলনে বনেদি গরিমা ঠিকরে বেরোয় এ হেন পরমেশ ভূসিমাল কিম্বা কাপড়ের মহাজন হয়ে বসেছে, ভাবতে পারা যায় না।

সর্বাগ্রে অজয় এবং অনতিপরে প্রফুল্ল ও শৈলবিহারী এসে পড়ল। আটটা বেজেছে, সবে মাংস চেপেছে তখন। রান্নার

অনেক বাকি। নরোত্তম অপ্রতিভ হলেন—তাসখেলায় বসিয়ে দিলেন সময় কাটাবার জন্য। চতুর্থ খেলুড়ের অভাবে নরোত্তম নিজেই বসলেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁকে দিয়ে এসব হয় না, দার্শনিক লোক—হরতন ডাকতে রুইতন ডেকে বসেন, সাহেব-গোলামের চেহারার তফাৎ ধরতে পারেন না অনেক সময়।

তার পরে পরমেশ এল। নরোত্তম উঠে পড়লেন—পরমেশের হাতে তাস দিয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। রান্নাঘরে ঠাকুরকে তাগাদা দিয়ে এলেন একবার। ক'টা বাজল দেখতে গিয়ে নজর পড়ল, টাইমপিসটা বন্ধ হয়ে আছে দম দেওয়ার অভাবে। মিলিয়ে নেবার জন্য এলেন এঁদের কাছে।

খেলা ইতিমধ্যে বড্ড জমেছে। প্রফুল্ল পকেট থেকে ঘড়ি বের করে টেবিলে রাখলেন। মিলিয়ে দেখে নিয়ে নরোত্তম চলে গেলেন।

তাসের দু-বাজি উঠে গেছে, অনেক রাত হয়েছে, গৃহকর্তার সাড়া নেই এখনো। পোলাও চেপেছে, তার সুগন্ধ আসছে নাকে। কিন্তু প্রফুল্ল ডাক্তারের পক্ষে আর পনের-বিশ মিনিটের বেশি কোনক্রমে থাকা সম্ভব নয়। পেনিসিলিন-চিকিৎসা হচ্ছে একটা রোগির, ইনজেকশনের সময় হয়ে এল। সময়টা সঠিক জানবার জন্য পকেট হাতড়ে দেখেন, ঘড়ি নেই। তুলতে যদি ভুলে গিয়ে থাকেন—টেবিল খুঁজলেন, টেবিলের তলায় ও আশে-পাশে উঁকিঝুঁকি দিলেন—কোনখানে নেই। গেল কোথায় তা হলে? সোনার ঘড়ি—এ-বাজারে সাত-আট শ' টাকা দাম তো বটেই—

বৃত্তান্ত শুনে নরোত্তম হন্তদন্ত হয়ে এলেন। কি লজ্জা, কি লজ্জা! ভদ্রলোককে বাড়িতে আহ্বান করে এই ঘড়ি-চুরির কারণ হলেন। কি ভাবছেন উনি মনে মনে?

জিজ্ঞাসা করলেন, কোন চাঁকর-বাকর কি বাইরের কেউ এসেছিল, বলতে পারেন ?

না—

আপনারা খেলছিলেন তদ্গত হয়ে। এমন হতে পারে, এসেছিল—দেখতে পান নি।

শৈলবিহারী রীতিমত মুগুর ভাঁজে, কসরৎ করে। কথাবার্তা তার পালোয়ানি ধাঁচের। বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—খেলছিলাম। ধ্যান করছিলাম না চোখ বুজে। কেউ এলে নির্ঘাৎ নজরে পড়ত।

অজয় বলে, নরোত্তম বাবু, আপনি সেই যে ঘড়ি মিলিয়ে চলে গেলেন, আর কেউ আসে নি—এসম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। তা হলে এখন আমাদের উচিত, প্রত্যেকের সঙ্গে কি আছে না আছে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দেওয়া। তোমার তো সার্চ করা অভ্যাস আছে শৈল-দা, আমায় দেখে নাও।

বলে সে উঠে দাঁড়াল। এবং শৈলবিহারীও বিনাদ্বিধায় তার পকেট উলটে জামা খুলে কোমর টিপে যথারীতি তল্লাস করছে।

নরোত্তম হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

আঃ, কি হয়েছে তোমাদের ? তোমরা কেউ চুরি করেছ, এ কি স্বপ্নেও ভাবা যায় ?

শৈলবিহারী বলে, কিন্তু ঘড়ির পাখনা গজায় নি, উড়ে যেতে পারে না—

অশেষবিধ পরীক্ষান্তে অবশেষে শৈল রায় দিল, ঠিক আছে। এবার আমায় দেখে নাও তোমরা কেউ—

পরমেশের মুখ কালো। উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

আ-হা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন পরমেশ বাবু? আমার হয়ে যাক আগে। তারপর আপনার—

পরমেশ ততক্ষণে দরজা অবধি চলে গিয়েছে। অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলল, চললাম আমি—রাত্রি হয়ে গেছে···মনে ছিল না—এখুনি ভয়ানক একটা কাজে—

ভয়ানক কাজের সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বোঝা গেল না, কথা শেষ না করেই সে রাস্তায় পড়ল। হন-হন করে অতি-দ্রুত চলল।

দাঁড়ান পরমেশ বাবু, দাঁড়িয়ে যান। আমরা সবাই যখন দেখাচ্ছি, আপনারও দেখিয়ে যাওয়া উচিত—

এসব পরমেশের কানেই গেল না। দস্তুরমতো দৌড়তে আরম্ভ করেছে।

আর দেখতে হবে না শৈল-দা। ধরো। ওরই কাজ। রাজপুত্তুর সেজে বুজরুকি করতে এসেছে।

অজয় আর শৈল ছুটেছে। পরমেশও। কিন্তু ক্ষীণশক্তি পরমেশ কতক্ষণ পারবে শৈলবিহারীর সঙ্গে! গলি পার না হতেই শৈল তার হাতে এঁটে ধরল।

আসুন—দেখিয়ে যেতে হবে আপনাকে—

টানতে টানতে তাকে আবার নরোত্তমের বৈঠকখানায় নিয়ে এল। পরমেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে ডাক্তারকে সালিশ মানে।

দেখুন—অন্যায়টা দেখুন। ভুল হয়েছে এঁদের সঙ্গে মেলামেশা করা। ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম বোঝেন না।

পরমেশ প্রাণপণে কোটের দু-প্রান্ত এঁটে ধরেছে। খুলতে দেবে না কিছুতে। অতএব কিছুমাত্র সংশয় নেই, কোটের নিচে সিল্কের সার্টের পকেটে সেই ঘড়ি। শৈলবিহারীর বিষম রাগ হয়েছে—সজোরে সে চেপে ধরল পরমেশের নরম তুলতুলে হাত

দুটো। যেন বজ্রকঠিন সাঁড়াশি দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে—এমনি মনে হল পরমেশের; কব্জি মটমট করে উঠল। চোখে তার জল বেরিয়ে এল।

কিন্তু করুণা নেই। ভদ্রবেশী চোরদের এমনি শিক্ষা দিতে হয়। শৈল হাত ধরে রাখল, অজয় কোটের বোতাম খুলতে লাগল। কোটের নিচে সদ্য পাট-ভাঙা নিভাঁজ ঐ সার্টের বুক-পকেট এবং তলার পকেট দুটো খুঁজে দেখলে—

ও হরি! পকেট কোথায়—সার্টই নয় পুরোপুরি। কলার ও হাতার যতটা বাইরে বেরিয়ে আছে, সেইটুকু পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। বাকি অংশ প্রায় নেই—যা আছে শতচ্ছিন্ন, সেলাই-করা।

এই রাজপুত্র পরমেশ!

আর এদিকে এরা যখন পরমেশকে তাড়া করেছে, হঠাৎ কি মনে পড়ে নরোত্তম উপরে ছুটে গেলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন এই সময়।

এই যে ঘড়ি। আমি নিয়েছিলাম। ভুলো-মন—সময় ঠিক করে টাইমপিসের বদলে ওঁর ঘড়িটাই নিয়ে উপরে রেখেছিলাম। টাইমপিস ঐ যে—ওখানে পড়ে টকটক করছে।···এঃ-হে-হে—পরমেশের জামার এ দশা করল কে?

শৈলবিহারীর হাত ছাড়িয়ে পরমেশ দু-হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরুল। পরদিন শোনা গেল, সে শহর ছেড়ে চলে গেছে।

পদ্ম

(১)

সেই সাড়ে-দশটার সময় নাকে-মুখে চাট্টি ভাত গুঁজে বেরিয়েছিল। গ্রামারের ক্লাস পর পর পাঁচ ঘণ্টা। ছুটির পর এখন পদ্ম বাসায় ফিরছে। মুখ শুকনো, টলতে টলতে আসছে।

জুয়েলারির দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। পূজোর বাজার। কি চমৎকার সাজিয়েছে ছবি আর কাগজের ফুল-পাতা দিয়ে! দৃষ্টি ফেরানো যায় না। শো-কেসের কাছে এল। রোজ সে এই পথে ফেরে, রোজই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। কাচের ওপারে ঝিকমিক করে কত কি গয়না! একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখে নিশ্বাস ফেলে চলে যায়।

আজ একটা নতুন জিনিষ দেখল—একটা আংটি। হালকা জিনিষ—কিন্তু প্যাটার্নটি অভিনব। ডাঁটা সমেত একটি পদ্মফুল বৃত্তাকার হয়ে যেন আংটি হয়েছে। নিখুঁত মিনার কাজ করে ফুল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সোনার উপর।

সত্যি, চমৎকার জিনিষটা। তার নাম পদ্ম—নামের সঙ্গেও মানান হবে। ইস্কুল থেকে আজকেই পূজা-বোনাস দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা—ভ্যানিটি-ব্যাগে পুরোপুরি পাঁচখানা নোট। একটু ইতস্তত করে পদ্ম দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ল।

আংটি শো-কেস থেকে বের করাল। হাতে নিয়ে মসগুল হয়ে গেল। আর ফেরত দিতে ইচ্ছে করে না।

দাম শুনে পদ্ম স্তম্ভিত হয়ে যায়। পঁচাত্তর।

এই তো জিনিষ! সোনা কতটুকু আছে, কিসে অত দাম?

সোনার দাম নয় ম্যাডাম, জয়পুরি কাজ দেখতে পাচ্ছেন—তার দাম। আংটি তো কত পরে থাকেন, এটাও পরে দেখুন না। আঙুলে কেমন মানায় দেখুন।

পদ্ম বলে, অত টাকা নেই আমার কাছে এখন। রেখে দিন, কাল নিয়ে যাব।

থাকে তো নিশ্চয় পাবেন। কিন্তু কালকের দিন অবধি পড়ে থাকবে বলে মনে তো হয় না। একেবারে টাটকা ডিজাইনের কিনা! পারেন তো আজকের মধ্যেই নিয়ে যাবেন।

(২)

ঝকঝকে প্রকাণ্ড এক মোটর ব্রেক কষে থামাল ফুটপাথের ধারে। রুবি মুখ বাড়াল।

পদ্ম না? আজকে মাত্র কলকাতায় এসেছি, আজই দেখা হয়ে গেল তোর সঙ্গে। আয়—

সাগ্রহে রুবি দরজা খুলে দিল।

পদ্ম বলে, না ভাই, আজ নয়। উঠেছিস তোর বড় মামার বাড়ি তো? যাব একদিন।

রুবি গলা খাটো করে বলে, যাস ভাই, নিশ্চয় যাস। এক-গলা কথা জমে আছে। গেল অঘ্রাণে এক রোমান্টিক ব্যাপার ঘটে গেছে। সমস্ত বলব। কবে যাচ্ছিস?

পরশু-তরশু যাব একদিন। তারপর পদ্ম এমন ভাব দেখায়, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল কথাটা। বলে, পঁচিশটা টাকা আছে ভাই রুবি? এক্ষুণি দরকার।

দশ টাকার নিচে খুচরা নোট না থাকায় রুবি তিরিশ টাকা দিল।

পদ্ম বলে, মাসের আর আট দিন বাকি আছে। পয়লা মাইনে পেয়েই টাকাটা দিয়ে আসব।

রুবি বলে, দিস কিন্তু—ভুলে যাস নে। এ ক-দিন ঘুমুতে পারব না ভাই, টাকা ফেরত দিবি কি না দিবি সেই ভাবনায়—

হাতে হাত ধরা ছিল, রাগের ভঙ্গিতে ঝাঁকি দিয়ে রুবি হাত সরিয়ে নিল। বলে, তিন বছরে তুই অনেক বদলে গেছিস পদ্ম—

গাড়ি চলে গেল। পদ্মও ভাবছে, তিন বছরে অনেক বদলেছে রুবি। মোটা হয়েছে, আর রঙ যেন ফেটে পড়ছে। হবে না কেন, ভাল খাচ্ছে, ভাল পরছে, বাপের সঙ্গে দিল্লি-সিমলা করে বেড়াচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেছে নাকি? যখন হাতে হাত ধরেছিল, চুড়ির মধ্যে দেখল যেন লোহা।

(৩)

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। সমর এসেছে। সে পদ্ম এখন আর নয়। কাজল-রেখায় চোখ দু'টি দীর্ঘায়ত, প্রসাধন-মার্জিত মুখখানা উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে, হীরার মতো দাঁত—হাসছে, যেন আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে।

একটা জিনিষ কিনেছি আজ—

কি?

বলব না তো। এই আমার মুঠোয় আছে। ক্ষমতা থাকে, কেড়ে নাও কেমন পারো—

ছুটোপাটি শুরু হয়। সমর দৌড়ে আসে। পদ্মও দৌড়চ্ছে। আঁচল মেজেয় লুটায় দৌড়তে গিয়ে।

হঠাৎ সমর থমকে দাঁড়াল।

কি হল? হেরে গেলে, স্বীকার করো—

দুমদাম মেজেয় আওয়াজ হচ্ছে বড্ড। কেউ যদি এসে পড়ে!

হেরে গিয়েছ তা হলে, কেমন? পদ্মর চোখে বিদ্যুৎ, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ঠোঁটে মাখানো। বলে, আচ্ছা—কাছে এসো। দেখাচ্ছি। কিন্তু—

লীলায়িত ভঙ্গিমায় পদ্ম আবার কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। বলে, না—দাঁড়াও তুমি। আমিই গিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। হাত দু-খানা উঁচু কর—

ডাকাতে রিভলভার ধরে হাত তোলায় যে রকম?

তা-ই—

বিনা প্রতিবাদে সমর দু-হাত মাথার দু-পাশে তুলে দাঁড়াল।

পদ্ম বলে, আর কথা দাও, হাত মোটে নামাবে না। নইলে! কিন্তু যাচ্ছি না কাছাকাছি। গিয়ে আবার কোন্ বিপদে পড়ব!

সমর বলে, আচ্ছা, দিলাম কথা—

সাদা ধবধবে সিল্কের কামিজ সমরের গায়ে। পকেটের ভিতর আংটিটা ফেলে দিয়ে পদ্ম সরে এসে দাঁড়াল।

সমর বের করে দেখে বলল, বাঃ, খাসা! কিন্তু আংটি দিচ্ছ—পরিয়ে না দিলে নেব না তো!

পদ্ম বলে, মানে বোঝ আংটি পরিয়ে দেবার?

এনেছ যখন আমার জন্যে, পরিয়ে দিতেই হবে। নয় তো এই রেখে দিয়ে চললাম।

সমরের অনামিকায় আংটি পরিয়ে মুগ্ধ চোখে পদ্ম দেখতে লাগল। দেখে আর মিটি-মিটি হাসে।

সমর বলে, দান করলে দক্ষিণা দিতে হয়।

যাও, বড্ড ইয়ে তুমি—

বিনা দক্ষিণায় দান অসিদ্ধ। শাস্ত্রের কথা। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করে দেখো ঠাকুবমশায়কে।

পদ্ম আদেশ কবল, চোখ বোঁজ তুমি। বুঁজেছ—দেখতে পাচ্ছ না তো?

হঠাৎ পদ্ম ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে। তাবপব এক পলকে পাশের দবজা দিয়ে অদৃশ্য।

সমব বলে, এ কি—বুলেট ছুঁড়লে পদ্ম, ছুঁড়েই ভীরুর মতো পলায়ন! সম্মুখ-সমরে এসো—

(৪)

মাইনে পেয়ে পদ্ম ধাব শোধ দিতে গেছে। কবি জড়িয়ে ধবল। বলে, দেখাতে পাবলাম না ববকে ভাই। সন্ধ্যাব পব এসেছিল, সকালবেলা এই খানিক আগে চলে গেছে। শ্বশুরবাড়িও তো নয়, মামা-শ্বশুববাড়ি—তাই মোটে আসতে চায় না। এলেও যতটুকু সময় থাকে, ছটফট কবে—যেন জল-বিছুটি মাবে ওকে। বাড়িও মিলছে না, ছোটখাট একটা বাড়ি পেলে উঠে চলে যাই —ঘব-গৃহস্থালি পাতি গিয়ে সেখানে।

তিনখানা নোট পদ্ম টিপয়েব উপব বই চাপা দিয়ে বাখল।

কবি বলছিল, সাত দিনেব মধ্যে বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেল, একেবাবে নবেলি ব্যাপার। কাউকে তাই খবব দিতে পারি নি। দিলেও কি আব যেতে পাবতিস দিল্লি অবধি?

হঠাৎ যেন সাপ দেখে পদ্ম শিউবে উঠল।

খাসা আংটি তো! দেখি—

রুবি আঙুল থেকে খুলে দিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমার বরের। চমৎকার রুচি ওর। আর আমার স্বভাব তো জানিস—ভাল জিনিষ দেখলেই মন নেচে ওঠে, দখল না করা অবধি সোয়াস্তি পাই নে। মুখ ফুটে চাইলাম আংটিটা, তা ভাই কিছুতে দিল না, দুষ্টুমি করে হাত মুঠো করে রইল। মারামারি হল, ওর সঙ্গে কি করে পারব ভাই—জব্দ হলাম আমিই।

সেই জব্দ হবার স্মৃতি মনে পড়েই বুঝি মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল রুবি।

বলে, আমিও নাছোড়বান্দা। ভোরবেলা ঘুমিয়ে ছিল, সেই সময় চুপি-চুপি খুলে নিয়েছি। এমন মানুষ—যাওয়ার সময়টাও খেয়াল হল না।

পদ্মার মুখ সাদা হয়ে গেছে। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তোর বরের নামটা কি ভাই রুবি?

ধ্যেৎ—বরের নাম বুঝি কেউ করে! পদ্মর কাছে এসে কানে কানে বলল। হেসে উঠল খিলখিল করে।

(৫)

সমরের হাত তুলে ধরে পদ্ম বলে, আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম, কোথায় তা? খুলে রেখে এসেছ কেন?

সমরের মুখ শুকাল।

তাই তো—কোথায় যে গেল! চুরি হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। মন বড্ড খারাপ হয়ে আছে সেজন্য। বিশ্বাস করো, আমার এতটুকু অবহেলা ছিল না। তবু যে কেমন করে—

পদ্ম হাসতে লাগল। বয়ে গেছে, ভারি তো দাম!

সমর বল্লে, জিনিষটার দাম না হোক, তুমি যে দিয়েছিলে বড্ড আদর করে—

কিছু না, কিছু না—

শান্ত মুখে পদ্ম আংটি বের করে আনল। বলে, রুবিকে দিয়ে দেবেন। আঙুলে পরে এক বন্ধুর কাছে যাব, সেজন্য চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। দরকার হল না, সে বন্ধু মরে গেছে।

পোস্টমাস্টার

(১)

অনেক লেখালেখি ও তদ্বির-তাগাদার পর নতুন পোস্টাফিস হল। বনমালী বিষম খুশি। বলেন, সরকারি আফিস—কতখানি ইজ্জত বাড়ল গাঁয়ের! ধরো না কেন—খবরের কাগজ যার নামেই আসুক, মোড়ক খুলে পড়ে নেওয়া যাবে; চিঠিপত্র বাসি হয়ে পচবে না হারাণ পিওনের ব্যাগে। আমার চণ্ডীকোঠা ছেড়ে দিচ্ছি, সেখানে আফিস হোক।

তাই হল।

এক ছোকরা—বনমালীরই স্বজাতি, কাঁথি না কান্দি কোথায় বাড়ি—এসেছে পোস্টমাস্টার হয়ে। বনমালী প্রস্তাব করলেন, একটি মানুষ—কেন মিছে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামা করবে? আমার বাড়ির উনুনে দিনরাত রাবণের চিতে জ্বলছেই, দু-সন্ধ্যায় বাহান্নখানা পাতা

পড়ে। তার উপর একজন বাড়তি হলে খোঁজে আসবে না। তাই এসো বাবা, বড্ড খুশি হব।

সুধাংশু হেসে বলে, বেশ তো—

কিন্তু মোটঘাট এসে পৌঁছলে দেখা গেল, তুলে ফেলছে সতীশ দত্তর দোতলায়। সতীশ দত্ত কলকাতায় থাকেন, তাঁর কি রকম আত্মীয়ের মধ্যে পড়ে নাকি সুধাংশু। বাড়ি তালা-বন্ধ থাকে—তালার চাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর বিষ্টু বলে একটা লোকও ঠিক করে পাঠিয়েছেন সতীশ।

মাইনে পঞ্চান্ন টাকা, কিন্তু সুধাংশু বেড়ায় যেন এক লাট-সাহেব। ধোপদস্ত কাপড়-জামা রোজ সকালে ভাঁজ ভেঙে আফিসে পরে আসে, মাছ কিনতে গিয়ে জেলের ডালার উপর ঝনাৎ করে পুরো টাকাটা ফেলে দেয়। লক্ষপতির ছেলে, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে—এমনি নানা রটনা হতে লাগল সুধাংশুর সম্বন্ধে।

(২)

মাস দুই পরে বিকালবেলা সুধাংশু ঘাড় নিচু করে কাজ করছে, চুড়ির শব্দে মুখ তুলে দেখে—বনমালীর মেয়ে শোভা।

কি ?

খাম দিন, পোস্টকার্ড দিন…উঁহু—পয়সা আনতে ভুলে গেছি। তা হলে মনি-অর্ডারের ফরমই দিন খানচারেক। ওর তো দাম লাগে না—

সুধাংশু বলে, দরজার উপরটায় চেয়ে দেখ নি বুঝি ! ঐ যে—

নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছেন ? ইংরেজিতে লেখা—মানে তো বুঝি নে—

বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাধারণের প্রবেশ-নিষেধ। এটা আড্ডাখানা নয়—

শোভা বলল, তিন-পুরুষের চণ্ডীকোঠা আমাদের—

কিন্তু এখন সরকারি আফিস। আর সরকারি মানুষ আমি এখন।

তারপর হেসে উঠে সুধাংশু বলল, যাবার সময় তোমাদের বাড়ি হয়ে যাব। ভাল করে পান সেজে রাখগে মজা-সুপারি দিয়ে। তখন সরকারি মানুষ থাকব না।

(৩)

মাস চারেক কাটল। আষাঢ় মাস। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে আজ ক'দিন। কোনদিকে কেউ নেই। কাজ ছিল না, টেবিলে চিঠির গাদার পাশে পা তুলে অফিসের ছুরি দিয়ে সুধাংশু নখের উপরটা আঁচড়াচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে শোভা বারান্দায় এসে উঠল।

এই চিঠিখানা মাস্টারবাবু, ডাক-বাক্সে না ফেলে আপনার হাতে দিতে বললেন বাবা।

খামের চিঠি, সুধাংশু ঠিকানা পড়ল। মুচকি হেসে বলে, ওঃ, ঝাঁপায় যাবে চিঠি, জরুরি চিঠি!

ভাল করে শোভার দিকে চেয়ে সে বিষম ব্যস্ত হল। ইস, ভিজে জবজবে হয়ে গেছ। কাপড় ছাড়গে যাও, অসুখ করবে—

শোভা বলে, আপনার জন্যেই তো! আপনার বিষ্টু এসেছিল, কাঠ অভাবে রান্না করতে পারছে না। চালাঘরে আমাদের চাল অবধি কাঠ বোঝাই। বাবার ভয়ে হাত দেবার জো নেই। কানাচে কচুবনে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কত কষ্টে চুরি করে ক-খানা বের করে দিয়ে এলাম!

সুধাংশু বলে, আমিও দেখেছি—কাঠের পাহাড়। কি হবে অত কাঠ?

আমার শ্রাদ্ধে যজ্ঞির রান্না রাঁধতে লাগবে। চিঠিপত্র হরদম আসছে যাচ্ছে—বুঝতে পারছেন না?

কেমন এক ধরনের হাসি হাসছিল শোভা। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে সুধাংশু অবাক হয়ে গেল।

রোজ রোজ অত চিঠি যায় নাকি মাস্টারবাবু?

গর্বিত কণ্ঠে সুধাংশু বলে, এই ক-মাসে কত উন্নতি হয়েছে, তা হলে বোঝ।

তবে আর কাঠ-কাঠ করে কেন মরছে বিষ্টুচরণ? আজে-বাজে চিঠি কত যায় আসে, বাদলার দিনে তাতেই তো রান্না চলতে পারে।

হেসে ফেলে সুধাংশু বলে, কিন্তু কোনটা বাজে কোনটা কাজের বুঝব কি করে?

পড়ে দেখতে হয়, বুদ্ধি করে বুঝে নিতে হয়। লেখাপড়া শিখেছেন তবে কি করতে?

বলতে বলতে শোভা নেমে পড়ল। জোরে বৃষ্টি এল এই সময়টা। তবু সে থামল না, এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। এলোচুলে জলের ধারা বেয়ে পড়ছে।

পরদিন সুধাংশু ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছে, শোভা জলেব কলসি নিয়ে ফিরছে, পলকের জন্য দেখা হল। সুধাংশু বলে, খুব বুদ্ধিটা বাতলে এসেছিলে। ভাগ্যিস! বাজে চিঠি বাছতে শুরু করে দিয়েছি কাল থেকেই।

(৪)

ঝাঁপার ব্যোমকেশ মিত্তিরেব ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। যা তাঁরা দাবি করেছেন, বনমালী মোটামুটি তাতেই রাজি। সেই মর্মে

চিঠি লিখে দিয়েছেন। তারপর থেকে প্রতিদিনই আশা করছেন, পাত্রপক্ষ এসে পাকা দেখে যাবেন শোভাকে। কিন্তু না আসেন তাঁরা, না আসে চিঠির জবাব। বনমালীর কন্যাদায়—নিজেই শেষে একদিন ঝাঁপায় চলে গেলেন।

ব্যোমকেশ বললেন, তারপর? কি মনে করে এদ্দিন পরে হঠাৎ?

বনমালী অবাক হলেন। সে কি কথা?

ছেলের বিয়ে সাব্যস্ত করে ফেলেছি মশায়, আপনাদেরই পাশের গ্রামে—দহকুলোর রাহুতদের মেয়ে।

সে কি কথা! আপনি যা চেয়েছেন, তাতেই তো রাজি হয়ে গেলাম—

সেটা কি মনে মনে? একখানা চিঠি অবধি দিলেন না। আমি উল্টে দু-খানা লিখলাম, জবাব দিলেন না। বেশ করলেন, উত্তম কাজ করলেন। ছেলে আমার ফেলনা নয়, দেখে নিন এবার।

ষড়যন্ত্র—চিঠি তা হলে সব মারা যাচ্ছে বেয়াই—

বনমালী ব্যাকুল হয়ে ব্যোমকেশের হাত জড়িয়ে ধরলেন। দহকুলোর সম্বন্ধ ভেঙে দিন। দিতেই হবে। আগে যখন আমার সঙ্গে কথা—

দেখি—বলে ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়লেন।

(৫)

রাগে ফুলতে ফুলতে বনমালী ফিরে এলেন। চণ্ডীকোঠার সামনে এসে খুব একচোট বচসা হল সুধাংশুর সঙ্গে।

ঝাঁপার চিঠিপত্র যায় সব কোথায়?

জানি না—

জান তুমি সমস্ত। কালসাপ এনে বসিয়েছি। গ্রামসুদ্ধ মিলে দরখাস্ত দিচ্ছি তোমার নামে। চাকরি ছাড়িয়ে ঘরের ছেলে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ—

মুখ পাংশু হয়ে গেছে সুধাংশুর। বলে, বিদেশি মানুষ বলে যা-তা বলছেন আমায়। কেন, কি করেছি আমি? কি প্রমাণ পেয়েছেন বলুন—

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই ঝগড়া আর এক দফা। গিন্নি রুখে এসে পড়লেন। কি লাগিয়েছিলে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে? বলতে গেলে আমাদেরই আশ্রয়ে রয়েছে—খামোকা তুমি ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান করে এলে?

বনমালী ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু ঝাঁপার চিঠিপত্রগুলোর কি পাখনা বেরোয়, উড়ে পালিয়ে যায় পোস্টাফিস থেকে? শোভা নিজে হাতে করে ডাকে দিয়ে এসেছে—

শোভা তো! তবেই হয়েছে। নিজের মেয়ের কাছে ভাল করে তা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখ আগে।

শোভা বাড়ি ছিল না, ডাকতে পাঠালেন।

বিস্মিত বনমালী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপারটা কি? খুলে বলো তো—

গিন্নি চুপিচুপি বললেন, ঝাঁপায় বিয়ের নামে কেমন ঝিম-ধরা হয়ে যায় তোমার আহ্লাদি মেয়ে। ওখানে বিয়ে হয়, ওর মোটে ইচ্ছে নয়।

শোভা এসে দাঁড়াতে বনমালী জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠিটা সেদিন ডাকে দিয়েছিলি তুই?

হুঁ—

গিন্নি বললেন, ঠিক করে বল্ মা। ভদ্রলোকের ছেলের নামে দরখাস্ত করতে যাচ্ছেন এঁরা। তার চাকরি যাবে। মনে আছে তো সেই চিঠির কথা?

হুঁ—

কি মনে আছে?

শোভা বলে, চিঠিটা ভিজে গিয়েছিল। উনুনের ধারে শুকোতে দিয়েছিলাম। তারপর—

বনমালী অধীর হয়ে বললেন, শুকোলে তারপর ডাকে দিয়ে এসেছিলি কি না, মনে করে বল্—

না বাবা, উনুনের ভিতর পড়ে গিয়েছিল।

আপনা-আপনি? বনমালী মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন এবার। না কেউ ফেলে দিয়েছিল উনুনের মধ্যে? সত্যি কথাটা খুলে বল্ দিকি লক্ষ্মী মা আমার—

গিন্নি বললেন, সন্দেহ তোমার এখনো যাচ্ছে না? আমি বলছি, সে রকম ছেলে নয় আমাদের সুধাংশু।

(৬)

সুধাংশু ক-দিন পরে এসে বলল, চিঠি-চিঠি করছিলেন, এই নিন ঝাঁপার চিঠি। ডাকে এসে পৌঁছলে ঘরে আসে কিনা এই দেখুন। নিজে নিয়ে এসেছি। ডাকেই যদি না দেওয়া হয়, কিম্বা পিওনের ব্যাগ থেকে যদি খোয়া যায়, সকল জবাবদিহি যেন আমার!

শোভার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠি—

পরম পোষ্ট্‌বরেষু, কথা হইযাছিল—আপনি নগদ পণ পাঁচ শত টাকা মাত্র দিবেন। কিন্তু দহকুলার রায় মহাশয় হাজার অবধি দিতে প্রস্তুত। অতএব আপনি যদি দেড় হাজার অন্তত পক্ষে বারো শত পর্যন্ত উঠিতে পারেন—

পোস্টকার্ড নিয়ে বনমালী তখনই জবাব লিখলেন—

পরম পোষ্ট্‌বরেষু, আপনার পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করা আহাম্মুকি হইয়াছিল। এখানকার পোষ্টমাষ্টার ছেলেটি লক্ষপতির সন্তান, তাহার স্বভাব-চরিত্রও অতি চমৎকার। পাত্র হিসাবে আপনার পুত্র তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। ঐখানেই আমাদের শুভকর্ম করিবার আন্তরিক ইচ্ছা। আশা করিতেছি, শ্রীমান দু-একদিনের মধ্যে আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। তাহা হইলে আপত্তির কিছুমাত্র কারণ থাকিবে না—

(৭)

উঠানে খণ্ড-প্রলয়। ব্যোমকেশ নিজে এসে পড়েছেন, সঙ্গে দুটো দারোয়ান। বলেন, দহকুলো থেকে ফিরছি মশায় লগ্নপত্র পাকা করে। কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি, কথাবার্তা ভেঙে গেল—তা বলে কি অধিকাব আছে নাহক এমন অপমান করে চিঠি লিখবার?

চেঁচামেচিতে পাড়াব লোকজন এসে পড়েছে। সকলের মাঝখানে বনমালীব সেই চিঠি ফেলে দিয়ে ব্যোমকেশ বলতে লাগলেন, বলুন আপনারা—ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোককে কেউ লেখে এইবকম চিঠি?

প্রবীণেরা বলতে লাগলেন, না বনমালী, অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। মাপ চাও তুমি মিত্তিব মশায়ের কাছে।

মাপ চাইতে হল বনমালীর। সকলে মধ্যবর্তী হয়ে গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। সবাই চলে গেছে, সুধাংশু কেবল আছে। বনমালী গর্জন কবে উঠলেন, তোমার জন্যই তো—

সভয়ে সুধাংশু বলল, আবার আমি কি করলাম?

ঐ চিঠি চলে তো গেল দিব্যি তোমার হাত দিয়ে! মেয়ের বিয়ের দায়ে আমার না হয় মাথা খারাপ হয়েছিল, তোমার তো হয় নি!

তা হলে বুঝতে পারছেন, কোন চিঠি কখনো আমি পড়ি নে— নষ্ট করা তো পরের কথা। মিথ্যে দোষারোপ করেছিলেন আমার উপর—

কেন পড় না, সেই তো দোষ। এত চেষ্টা-চরিত্র করে গাঁয়ের মধ্যে আমাদের নিজেদের ডাকঘর হল, পাকা ঘরখানা ছেড়ে দিলাম, আর সেই ডাকে কি যাচ্ছে না যাচ্ছে—একটাবার দেখেও দিতে পার না? কলিকাল এমনি বটে!

অপরাধীর মতো সুধাংশু চুপ করে থাকে।

বনমালী তখন নরম হয়ে বললেন, তা বেশ—আগে না দেখে থাক, দেখলে তো এখন চিঠি! আর এ নিয়ে কি কাণ্ডটি হয়ে গেল, তা-ও দেখলে। বলো, কি বলবার আছে এবার—

সুধাংশু বলে, সত্যি বলছি, শোভার বিয়ের সম্পর্কে—

একগাল হেসে বনমালী বললেন, হ্যাঁ—বিয়ের সম্পর্কেই তো! তা এত লজ্জা কেন আজকালকার ছেলের? বলো বাবা, খুলে বলো। শোভার বিয়ে দিতে হবে তোমার সঙ্গে? বেশ, বেশ—তাই হবে। আহা, বলছি তো—মত আছে আমাদের! তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দাও—

ভুবনমোহন

কুঁজো, মিশকালো রং, দৈত্যের মতো চেহারা। নাম ভুবনমোহন।

মরার কথা বললে সে আগুন হয়ে ওঠে।

আমি কেন মরতে যাব হ্যাঁ? যাদের দশটা-পাঁচটা আছে তারা মরুক, চোখের জলের পাথার বয়ে যাবে। দেখতে ভাল, শুনতেও মজা।

আগে নাকি ভাই ছিল, ভাইপো-ভাইঝিরা ছিল—বাড়িতে কোলাহল, হুটোপুটি। কেউ নেই এখন। বড় ভিটেয় শশার মাচা। সাবেক কালে যেখানে রান্নাঘর ছিল, সেখানটায় তালপাতার কুঁজি বেঁধে নিয়েছে। একা মানুষ, এই ঢের। লোকে বলে, ঘটিতে করে কিছু টাকা নাকি পোঁতা আছে ঐ ঘরেব মেজেয় তার মাদুরের তলায়। বাড়ির সীমানা ছেড়ে তাই সে নড়ে না। এখানে কোদাল পাড়ছে ঠুক-ঠুক করে, ওখানে ঘাস তুলছে—এই করে সারা দিনমান কাটায়। সন্ধ্যার পর টেমি জ্বেলে দাওয়ায় বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে তামাক টানে, একছিলিম শেষ হলে কলকে ঢেলে ফেলে নতুন করে আবার সেজে নেয়।

অলকা বলে মেয়েটা—এক চোখ কাণা। কষ্টে পড়েছে, ধান ভেনে কুটনো কুটে দশ বাড়ি চেয়েচিন্তে খেত। এখন গৃহস্থেরই দিন চলে না। চুপিচুপি কখন এসে ভুবনের মাচার সব চেয়ে বড় শশাটা ছিঁড়ে ফেলেছে, ভুবন সেটা বীজ রেখেছিল। রাগের বশে সে বিষম এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল মেয়েটার গালে।

অলকা কেঁদে উঠল। ভুবন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে। অলকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ভুবন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শেষে বলল, মাঁরব না? ভাত জোটে নি—মিথ্যে বলবার জায়গা পাস না? ভাতের বদলে শশা খেয়ে কেউ বাঁচে কখনো?

অলকা বলে, চাল ধারে দেয় না। দোকানি দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল।

তাই এসে বললি নে কেন রে হারামজাদি? চল্—বলে দিচ্ছি, দিয়ে দেবে সেরখানেক চাল।

তারপর থেকে দরকার হলেই অলকা দোকানে আসে, চাল নিয়ে যায়।

একদিন সে দোকানিকে বলল, কত দেনা হয়েছে, হিসাব দাও দিকি। মনিঅর্ডারে কিছু টাকা এসেছে। আজকে কিছু দিয়ে যাই, দু-দশ দিনের মধ্যে বাকি সমস্ত শোধ দিয়ে যাব।

দেনা এক পয়সাও নেই—

সে কি?

ভুবনমোহন সমস্ত শোধ করে যায়।

ভুবনের কাছে গিয়ে অলকা বলে, তোমার এই কাজ? হাতে একটা পয়সা ছিল না, চাল জুগিয়ে সেই সময় বাঁচিয়ে রেখেছ। পরশু তোমার নেমন্তন্ন—খাবে আমার ওখানে।

হাত ধরে বলে, যাবে তো?

নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন—খুব বড়লোক হয়ে গেছিস নাকি?

হয়েছি—হয়েছিই তো! সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই বুঝি আমার! রেঁধে-বেড়ে বসে থাকব তোমার জন্যে—না যাও তো দেখো কি করি—

ভুবনমোহন ধবধবে কাপড় পড়েছে, কাঁধে উড়ানি চাপিয়েছে। সাজসজ্জা করে নিমন্ত্রণ খেতে এল।

অলকারও বাহার খুব। মাথা ঘসেছে ক্ষার দিয়ে। কে দিয়েছিল আধ-ছেঁড়া ছাপা-শাড়ি—শাড়িটা ফেরতা দিয়ে পড়েছে। আনন্দ উপছে পড়ছে তার চোখে-মুখে।

ভুবনমোহনকে দেখে বলল, এসে গেছ? আর এদিকে এক মুশকিল হয়েছে—আমার মামাতো ভায়ের শালা ঐ এসেছে। লড়ায়ে গেছল, চার বছর বাদে আজকে এল।

কাছে এসে চুপি-চুপি বলে, ও-ই টাকা পাঠিয়েছিল মনিঅর্ডার করে। মাথা খারাপ—বলে কি জান?

হেসে এক চোখে ছেলেটাকে আর একবার দেখে নিয়ে বলে, বিয়ে করে বর্মায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে আমায়। বরাবর দেখেছি—যা জেদ ধরে, তাই করে তবে ও ছাড়ে। আস্ত পাগল!

ভুবনমোহন ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে সেই আগন্তুকের দিকে।

অলকা বলল, আর এক মুশকিল হয়েছে। তোমার জন্য রাঁধা-বাড়া করেছিলাম—আট দশ ভাগে হয়েছিল—এসে ক্ষিধের চোটে গবাগব সমস্ত খেয়ে নিল। তা বোসো, ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি—এক্ষুণি হয়ে যাবে।

ভুবনমোহন বলে, খেতে আসি নি—পাওনার হিসাবটা দিতে এসেছি। বিয়ে করে বর্মা যাবার আগে আমার পাওনা যেন মিটিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে দেখল, কে এসে ইতিমধ্যে মেজে খুঁড়ে তার সেই টাকার ঘটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

চাবুক

নতুন বর্ষা পেয়ে মেঘের মতো রং হয়েছে ধানবনের। দামিনী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ক্ষেতের এক পাশে ধানবন খুব আন্দোলিত হচ্ছে। কোথাও কিছু নয়—যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে ঐ জায়গাটায়।

যা ভেবেছ, ঠিক তাই। আ'লের উপর বসে বলাই ভুড়ুৎ-ভুড়ুৎ করে হুঁকো টানছে। মল বাজিয়ে দামিনী গিয়ে দাঁড়াল—তা বলাই মুখ তুলে দেখলই না একটিবার।

ঘোড়া কেন আমাদের ক্ষেতে?

ঘোড়া জানে। ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করে আয় গিয়ে।

পাক দিয়ে পিছন ফিরে দামিনী বাড়িমুখো চলল।

চোখ পাকিয়ে বলাই বলে, এই—বাপকে বলে দিবি তো চাবকে পিঠের চামড়া তুলব।

চাবুক তুলতে গিয়ে দেখে দামিনী কোন ফাঁকে সেটা তুলে নিয়েছে। নরম বেতের চাবুক—মাথার দিকটায় শখ করে চামড়া দিয়ে বাঁধানো।

দিয়ে যা বলছি। আস্ত রাখব না কিন্তু। কামরাঙা খেতে যাবি তো পাড়ায়!

দামিনী দৌড় দিল।

মাদার বাড়ি ছিল না, হাটে গিয়েছিল। অতএব আপাতত বলতে হল না বলে দামিনী সোয়াস্তি পেল। বলল রাত্রে হাটের পর। তারপর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বাপকে সামাল করে, কিছু বোলো না কিন্তু ওকে। বড্ড গোঁয়ার—খুন করে ফেলবে।

মাদার গরম হয়ে উঠেছিল, মেয়ের ভাব দেখে চুপ করে গেল।

আচ্ছা আচ্ছা—শুতে যা তুই—

এর দিন চারেক পরে মাদার আর কৈলাস পাশাপাশি ক্ষেতে ধান নিড়াচ্ছে। মাদারের মন ভাল ছিল না। ধানের চারা ঐ রকম খাইয়ে খাইয়ে যায়—সযত্নে সে গোড়ায় মাটি চেপে দিচ্ছিল।

কৈলাস বলল, মেয়ের বিয়ে দাও মাদার। বিয়ের যুগ্যি হলে দেরি করতে নেই, চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

ভ্রূকুটি করে মাদার বলে, বুঝেছি কৈলাস, নইলে তোমাদের জুত হবে কিসে? আমি চোখে ভাল দেখি নে, মেয়েটাকে সরাতে পারলে তোমার ঐ বজ্জাত বলাইটা আয়েস করে ধানগাছ কেটে কেটে ঘোড়ার মুখে দিতে পারবে!

কি কথার কি জবাব! চটে গিয়ে কৈলাস বলে, মেয়ে তবে বীজ রাখবে নাকি—লাউমাচায় এক-একটা লাউ যেমন রেখে দেয়? তাই হোক—ঘর-গৃহস্থালির দরকার কি—মেয়ে চিরকাল তোমার ধান-ক্ষেতের খবরদারি করে বেড়াক।

মাদার জবাব দিল না। পাশাপাশি বেলা তুপুর পর্যন্ত ক্ষেত নিড়াল। একটিবার আর মুখ ফিরাল না ওদিকে।

বছর তিনেক পরে বিয়ের কথা আবার উঠল। বেশ ঘোরালো

ভাবে উঠল এবার। কৈলাস তখন গত হয়েছে। মাদারকে জ্বরে ধরেছে, শয্যাশায়ী করে ফেলেছে তাকে। মেয়ে থুবড়ো—চলনে-বলনে দেমাক যেন ভেঙে ভেঙে পড়ে তার। কিন্তু কন্যাদায় সম্পর্কে কিছুমাত্র উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না মাদারের। একদিন যজ্ঞেশ্বর মোড়ল নামক ও-পাড়ার মাতব্বর গোছের একজন এল তাদের দেখতে।

বলি, সমাজ একটা আছে কি না আছে—বলো তুমি. মাদার? দশজনে যা সমস্ত বলে বেড়াচ্ছে, কানে ভাল লাগছে?

মাদার বলে, বাদার মধ্যে একলা এসে ঘর বেঁধেছি, উঁচু করে পাঁচিল দিয়েছি—কানে যাতে কিছু না যায়। তোমরা এসো না, কানে আসবে না তা হলে।

এমন মানুষ—এক-পা শ্মশানঘাটায়, এ অবস্থায়ও স্বভাব যদি কিছুমাত্র বদলে থাকে!

নাছোড়বান্দা যজ্ঞেশ্বর তবু বলে, শোন—উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ, কৈলাস মোড়লের ছেলে। ঘাড় নেড়ো না, শোনই না ভাল করে—

কি শুনব আবার? মাদার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। চোর এক নম্বর—ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে আমার ক্ষেতের ধান খাইয়ে যেত।

ঘাড় নেড়ে যজ্ঞেশ্বর বলে, না গো দাদা, বলাই নয়—আমি কানাইয়ের কথা বলছি। বলাইকে তো আলাদা করে দিয়েছে। শোন নি?

মাদার ভারি খুশি হল, হাসিতে তার মুখ ভরে গেল।

দিয়েছে নাকি? যা বজ্জাত—বাড়ির ত্রিসীমানায় ওকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।

যজ্ঞেশ্বর বলে, তাই করেছে। সে গিয়ে খাল-পারে ঘর বেঁধেছে।

তা বলো তুমি—ভাইয়ের জন্য ক'দিন আর লোকের গালমন্দ খেয়ে বেড়াবে? বাপের জমিজমা সমস্ত এখন কানাইয়ের। বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হচ্ছিল, কানাই কিনে নিয়েছে।

কানাইর নামে মাদার নরম হল। ওরকম ছেলে তাদের সমাজে নেই—এ তল্লাটের ভিতর তো নেই-ই। বাংলা লেখাপড়া শুধু নয়, ইংরেজিতেও নাম সই করতে পারে। রেজেস্ট্রি-অফিসে দলিল-পত্র লেখে—গোটা গোটা মুক্তার মতো হরপ অবলীলাক্রমে সাজিয়ে যায়—আটকায় না, ভাবতে হয় না এক মুহূর্ত।

কানাই বুঝি পাঠাল তোমাকে?

আমতা-আমতা করে যজ্ঞেশ্বর শেষটা স্বীকার করল।

এক রকম তা-ই বলতে পার। অমন পাত্র পাবে কোথায়? চার কুড়ি সাড়ে চার কুড়ি অবধি পণও দেবে বলেছে কানাই।

মাদার ভাবতে লাগল।

যজ্ঞেশ্বর বলে, বুঝে দেখ, ভাল করে চিকিচ্ছে হতে পারবে, ভালমন্দ পথ্যি পাবে। কানাই জামাই হলে ভক্তি করে কত কি এনে দেবে দেখো।

ঘাড় নেড়ে মাদার বলল, তাই হবে। কিন্তু অষুধপথ্যির জন্য নয়। ভাল ছেলে সত্যি কানাই। আমি সেরেসুরে উঠি—বাজি-বাজনা করে আমোদস্ফূর্তি করে দু-হাত ওদের এক করে দেব।

মাদার আর সেরে উঠল না, সেই অসুখে মারা গেল। শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার মাস ছয়েক পরে একদিন কানাই নিজে এসে উপস্থিত।

দেখতে এলাম গো তোমাদের।

এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে আরও খাতির বেড়েছে কানাইর। যেখানে

যায় জলচৌকি এগিয়ে আসে, মেয়েরা ঘরের ভিতর থেকে পান সেজে ডিবেয় করে পাঠিয়ে দেয়।

এ হেন কানাই উঠানে দাঁড়িয়ে। ফর্সা কাপড়-পরা দামিনী চিনাটোলার মেলা দেখে চষা-ক্ষেত ভেঙে বাড়ি এসে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গেল কানাই উঠানে দাঁড়িয়ে। ভাল-মন্দ একটা কথা বলল না—সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বগলা বলে দূরসম্পর্কীয় এক পিসি ঘরের কাজকর্ম দেখে। মাজা-বাসনের বোঝা নিয়ে সে আসছিল। এসে দেখে অবাক—চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

দাঁড়িয়ে কেন, উঠে বোসো বাবা—

কানাই বলে, তবু ভালো পিসিঠাকরুন, তুমি দেখতে পেলে এতক্ষণে। আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। ফরফর করে একজন তো ঘরে গিয়ে উঠল, মুখের কথাটা বলল না।

ও মেয়ে ঐরকম। রাগ কোরো না বাবা, বোসো—

রাগের কথা তো বটেই! কিন্তু এই মাস কয়েকের ভিতর চেহারা যা খুলেছে দামিনীর, ফর্সা কাপড়ের আঁচল উড়িয়ে পাখনা-মেলানো পরীর মতো যেমন করে সে সামনে দিয়ে চলে গেল, রাগ তাতে গলে জল হয়ে যায়। গলা বাড়িয়ে অন্তরঙ্গ সুরে কানাই প্রশ্ন করে, দামিনীর বিয়ে দেবে না? মাথার উপর কেউ নেই—দেরি করা মোটেই কিন্তু উচিত হচ্ছে না।

বগলা নিম্ন কণ্ঠে বলে, কার কথা কে শোনে বাবা? ঐ যে বললাম—বিষম খামখেয়ালি। তা তোমায় সবাই মানে গণে, তুমি একটিবার বলে দেখ না। দাদার তো ইচ্ছেই ছিল তোমার হাতে সমর্পণ করবার।

প্রশান্ত কণ্ঠে কানাই ডাকল, দামিনী, শোন দিকি একটু—

ঘরের ভিতর থেকে দামিনী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি ?

এসো না এদিকে—

যা বলবার ওখান থেকে বলো। কান আছে, শুনতে পাচ্ছি।

দেখ, এদ্দিন মাদার-খুড়ো বর্তমান ছিলেন। এখন একেবারে একলা। এই বাদার মাঝখানে—সঙ্গী-সাথী কেউ নেই—

একলা হব কেন ? আছে তো সঙ্গী-সাথী—

বগলা পিসি ? ওঁর থাকা না থাকা সমান। বুড়ো মানুষ—সন্ধ্যে হলেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েন।

খিল-খিল করে হেসে ওঠে দামিনী। বলে, আবো আছে, আবো—

স্তম্ভিত হয়ে যায় কানাই। এমনি একটা সন্দেহ মনে আসে বটে! কাব বলে সবাইকে সে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বেড়ায় ? কানাঘুসো এই ধরনেব দু-একটা কথাও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বেহায়া মেয়ে আজকে স্পষ্ট একেবাবে মুখের উপব বলে দিল, পিসি ছাড়াও অন্য সঙ্গী রয়েছে তাব। কানাইব সর্বশবীর জ্বলে উঠল। বলে, সে তো জানে সবাই। তোমাব নিন্দেয় গ্রামেব মধ্যে টি-টি পড়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দামিনী বলে, কে নিন্দে করে ?

কে নয় বলো ?

একজন যে তুমি, তা জানি। হঠাৎ মাবমুখি হয়ে দামিনী উঠানে ছুটে এল।

বেরোও—

আমায় বলছ ?

হ্যাঁ। গ্রামে রটিয়ে বেড়াচ্ছ, আবার আমাদের উঠোনে বসেও রটাবে? বেরিয়ে যাও এক্ষুণি। থুঃ থুঃ—

পাড়ায় হৈ-হৈ পড়ে গেল। কানাইর অপমান। অনেকে জমায়েত হয়েছে কানাইর চণ্ডীমণ্ডপে। যজ্ঞেশ্বর বলে, ও মেয়ে তোমার বাগ্দত্তা কানাই। অমন বয়ে যেতে দেওয়া হবে না—আমাদের সমাজের অপমান। নিয়ে এসো হারামজাদীকে। সহজে না আসে, লোকজন পাঠিয়ে জোর করে ধরে আনো। এনে বিয়ে করে ফেল। তখন কি করে দেখি। আমরা সব একজোট আছি, গ্রামসুদ্ধ তোমার পক্ষে।

বলাইও ছুটে এসেছে। বুকে থাবা মেরে সে বলে, লোকজন কিসে লাগবে একটা পুঁটকে মেয়ে নিয়ে আসতে? পুরুতের জোগাড় দেখ, বিয়ে আজকেই। আমি এনে দেবো মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেলে তখন উঠতে ঝাঁটা বসতে ঝাঁটা। তাহলে সায়েস্তা হবে। এত বড় সাহস—আমার ভাইয়ের গায়ে থুতু দেয়!

এদের হাঁকডাকের খবর বাদার মধ্যে দামিনীর কানেও অল্পবিস্তর পৌঁচেছে। বগলা ভয়ে আধ-মরা—দামিনীর অবস্থা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। সারা বিকাল বসে বসে সে মশাল বেঁধে নারিকেল-তেলে ভিজিয়েছে। সন্ধ্যা হতে না হতে পাঁচিলের দরজা বন্ধ করে মশাল জ্বালিয়ে কলাগাছে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দিল। ভিতরে সর্বত্র আলোকিত। বগলা দুর্গানাম জপ করছে।

শুধু মুখের আস্ফালন নয় বলাইর। দরজা বন্ধ দেখে একটা কাঁঠালগাছ বেয়ে উঠে অনেক কৌশলে পাঁচিলের উপর এসে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় এদের নজরে পড়ল। যেন কালো পাষাণে

খড়া নিটোল সমুন্নত মূর্তি—পাষাণের মতোই স্পন্দনহীন। মশালের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এই নিশিরাত্রে। বগলা আর্ত চিৎকার করে ওঠে। চাবুক হাতে ছুটে বেরিয়ে এল দামিনী। সেই চাবুক—বলাইর কাছ থেকে যা নিয়ে একদিন দৌড় দিয়েছিল।

এক মুহূর্ত। বলাই লাফিয়ে পড়ে দামিনীর হাত এঁটে ধরল। হাতে চাবুক ধরা আছে, তুলবার উপায় হল না। এমন কড়া হাতে বলাই ধরেছে যে কবজির হাড় বুঝি চুরমার হয়ে যায়! হুড়কো খুলে দড়াম করে পাঁচিলের দরজা খুলে ফেলল। কি ভেবে গরুর দড়ি দিয়ে হাত দু-খানা বেঁধে ফেলল দামিনীর। ঘোড়া ছিল বাইরে, ছোট পাখীটির মতো অবহেলায় তাকে তুলে নিয়ে বলাই ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

চলেছে, চলেছে। নিয়ে তুলল পৈত্রিক বাড়ি—বলাইকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আছড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে এক তক্তাপোষ ছিল তার উপর। যেমন লোকে কাপড়ের গাঁটরি কাঁধে করে এনে বোঝা ছুঁড়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ফেলে দিয়ে দাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল একটা জলচৌকির উপর। বলে, হুঁকো দাও—

আরও জন পাঁচ-ছয় সেখানে। হাতে হাতে হুঁকো চলছিল। বলাইর অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বরে সকলে তার দিকে তাকায়। টেমির ক্ষীণ আলোয় মুখ-ভাব ঠাহর হল না। আপন মনে হুঁকো টানছে বলাই তখন।

কানাই এসে চমকে উঠল। আহা-হা, নড়ে-চড়ে না—মরে গেছে নাকি? একেবারে মেরে এনেছিস?

দামিনী কেঁদে বলল, কেমন করে বেঁধে এনেছে দেখ। হাত কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

সকল অপমান ভুলে কানাইর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বলে, ওটা পশু। ধরে আনতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে।

বাঁধন খুলতে খুলতে বলাইকে লক্ষ্য করে বলে, কি করেছিস দেখ্ দিকি?

বলাই বলে, অত বেঁধেও চাবুকটা তবু ছাড়ানো যায় নি। ঠিক মুঠো করে নিয়ে এসেছে।

বন্ধনমুক্ত দামিনী তখন উঠে বসেছে। এক ঝলক দৃষ্টি দিল বাইরে বলাইর দিকে, দৃষ্টির আগুনে ঝলসে দিতে চায় যেন। ভাল লাগছে না বলাইর, মোটেই ভাল লাগছে না। অকারণে প্রশ্ন করে, বিয়ে আজকেই তা হলে?

ডাকাত মেয়ে হাত খোলা পেয়ে—আক্রোশ তো বলাইর উপর—কিন্তু সপাসপ চাবুক মারছে কানাইকে। এত যত্নে বাঁধন খুলে দিল, আর এই প্রতিদান! বুকে পিঠে রক্ত ফুটে ফুটে উঠল। উন্মাদিনীর মতো দামিনী মারছে—বিনুনি খুলে গেছে, মুখের উপর চুল এসে পড়েছে কতকগুলো—কেশর-ফোলানো সিংহীর মতো দেখাচ্ছে তাকে। বলে, সঙ্গী-সাথীর কথা বলেছিলাম সেদিন—এই যে, আমার এই চাবুক, তোমার ঐ গুণ্ডা ভাইটা দিয়েছিল আমায়।

লোকগুলো প্রথমটা হতভম্ব হয়েছিল, তারপর যে যা পেল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দামিনীরও সম্বিত ফিরেছে এতক্ষণে, ভয়ার্ত হয়ে বলাইর পিছনে ছুটে এল। এসে গুটিসুটি পিঠের আড়ালে দাঁড়িয়েছে।

প্রাণকেষ্ট ঢালি হাঁক দেয়, সরে যা বলাই। এত বাড় বেড়েছে! পিটিয়ে মেরে ফেলে ওকে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।

বলাই সরে দাঁড়াল, কিন্তু বাহুবেষ্টন করে ঝুলে আছে দামিনী।

ঝটকা মার্, ঝেড়ে ফেলে দে—

বজ্র-আঁটুনিতে চেপে ধরেছে, ঝেড়ে ফেলবে কার সাধ্য! পাহাড়ে মেয়ে—কিন্তু এমন নরম গা-হাত-পা যেন কে একখানা নরম তুলোর গদি বিছিয়ে দিয়েছে বলাইর পিঠে।

তোরই কারসাজি তবে? ডুবে ডুবে জল খাস।

প্রাণকেষ্ট লাঠি তুলল বলাইর মাথা লক্ষ্য করে। বাঁ-হাত দিয়ে ঠেকাতে গেল, বাঁ-হাতে পড়ল লাঠি। ছুটে গিয়ে আবার বলাই ঘোড়ায় চাপল।

অনেক দূর—প্রায় ক্রোশ খানেক এসে থামল তারা। কৃষ্ণা-দশমীর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় অদূরে দামিনীর বাড়ির নারিকেল-পাতা ঝিলমিল করছে।

নামো—ক্ষেতটুকু হেঁটে চলে যাও। উঃ, কি ধকলটা গেল! বাড়ি গিয়ে এবার ঘুমোব।

দামিনী জবাব দেয় না। নামবার কোন লক্ষণ নেই।

ভাল জ্বালা! তবে কি বাড়ির দুয়োরে নিয়ে তুলে দিতে হবে?

দামিনী বলে, তোমার বাড়ি চলো যাই। এ বাড়ি একা থাকব না, ভয় করে। আজকে তুমি এসেছিলে, কোন দিন হয়তো আবার কে এসে পড়বে।

জননী জন্মভূমিশ্চ

চির-নির্যাতিত লোকনাথ।

ইংরেজ বিদায় হয়েছে। এইবার মনে হচ্ছে, বাকি দিনগুলো তাঁর শান্তিতে কাটবে।

সভা করছেন তিনি। লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নেই।

শ্রবণা আর শুক্লা ইস্কুলে পড়িয়ে ফিরছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শুনল একটুখানি। মোহময় বক্তৃতা—না বসে পারা যায় না।

ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না—অনেক দূরে তিনি। তার উপর মাইকে মুখ আড়াল করেছে। কিন্তু সুধা ক্ষরিত হচ্ছে যেন লাউড-স্পীকার দিয়ে।

'বন্দে মাতরম্—জননী ও জন্মভূমি একই দৃষ্টিতে দেখি আমরা। অসহ্য দুঃখ-দহনের পর অবশেষে মাতৃমুক্তি সম্ভব হল। বন্ধুগণ, মাকে আমরা আবার ষড়ৈশ্বর্যময়ী করে তুলব রচনাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে—'

জীবনভোর অনন্ত দুঃখ পেয়েছেন—দুঃখ-দহন কথাটা ওঁরই মুখে মানায়, সত্যি।

প্রথম জীবনে বিলাতি সওদাগর-অফিসে চাকরি করতেন। গোলামি ধাতস্থ হল না, বচসা বাধল বড়-সাহেবের সঙ্গে। তহবিল-তছরুপের দায়ে ফেলে জেলে পুরবার আয়োজন করল তারা। ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল শেষ অবধি। 'বন্দে মাতরম্'—বলে হাসতে হাসতে কাঠগড়া থেকে লোকনাথ নেমে এলেন।

লবণ আইন-ভঙ্গ নিয়ে যখন ডামাডোল, সেই সময় ডাকাতি-কেসে ফেলে দ্বিতীয় বার লোকনাথকে জব্দ করার চেষ্টা হয়। সাহেব জজ ঠেসেও দিয়েছিল তিন বছর। হাইকোর্টের আপিলে খালাস পেয়ে গেলেন। বিপুল জনতা ফুলের মালা পরিয়ে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা করে লোকনাথকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

নির্যাতিত লোকনাথকে করপোরেশনে পাঠাবার প্রস্তাব হল। দু দু'বার জেল পিছলে বেরিয়ে এসেছেন—করপোরেশনের পক্ষে অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। রাজি ছিলেন তিনিও। পার্কে পার্কে সভা-সমিতি শুরু হয়েছে—একদিন ইট খেয়েও গেছে বিপক্ষদলীয় লোক সভা করতে এসে। এমনি সময় লোকনাথের স্ত্রী-বিয়োগ হল। ইষ্টকাহতের দল রটনা করতে লাগল, প্রচণ্ড একটি চড়ে লোকনাথই সাবাড় করেছেন ভদ্রমহিলাকে। ইংরেজ বরাবর তাঁর শত্রু—এক দঙ্গল দেশি লোক দলে পেয়ে এবারে জুত হল তাদের। ডাক্তার সাক্ষি দিলেন, হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু সরকারি তরফের চার জন প্রত্যক্ষদর্শী হলফ করে উল্টো কথা বলে গেল। জলের মতো টাকা ঢাললে চার কেন—চার শ' প্রত্যক্ষদ্রষ্টাও হাজির করা যায়। ফলে ডাক্তারের ডিগ্রি বাতিল হবার অবস্থা। বার বার—তিন বারের চেষ্টায় সিদ্ধকাম হল চক্রিদল। লোকনাথের আট বছর জেল হল।

আট বছর পরে বেরিয়ে এসেছেন স্বাধীন-ভারতে। এ পোড়া দেশের মানুষ ভোলা-মহেশ্বর—দু-দিনে সমস্ত বেমালুম ভুলে যায়। ইদানীং খবরের কাগজে ছবি ও জীবন-চরিত বেরোবার পর আবার

সকলের চাড় হয়েছে। করপোরেশনে যাচ্ছিলেন—এবারকার যা অবস্থা, রাইটার্স বিল্ডিং-এ মন্ত্রীর গদিতে চেপে না পড়েন! আট বছর একটানা জেল খেটে-আসা মানুষ—যাঁরা মন্ত্রী হয়ে আছেন, তাঁদের যোগ্যতা কোন হিসাবে বেশি লোকনাথের চেয়ে?

শুক্লা ও শ্রবণা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল চিরলাঞ্ছিত লোকনাথের জীবন-কথা। সভার এক উদ্যোক্তার কাছে থেকে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে নিল।

কষ্টি-পাথরের মতো কালো লম্বা-চওড়া বিশাল পুরুষ লোকনাথ আধভাঙা বাড়ির দালানে খড়ম পায়ে খট-খট শব্দে পায়চারি করছেন। অনেক উঁচু ছাত, প্রকাণ্ড এক একটা কড়ি। এক প্রান্তে ঝোলানো লণ্ঠন থেকে গলগল ধোঁয়া উঠছে। লোকনাথের চলন্ত ছায়া অতি দীর্ঘ হয়ে দেয়ালে পড়েছে। দেখে মনে হয়, বিপুলকায় দৈত্য আক্রোশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন নিঃশব্দ দৈত্যপুরীর ভিতর।

চা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা। সাধারণ কাপে নয়—সে কাপ মানাতও না লোকনাথের আজানু-বিস্তার হাতে। এনামেলের বড় এক বাটি ভরতি চা।

এক পাক গিয়ে ঘুরে আসতে লোকনাথের নজর পড়ল। নিচু হয়ে বৃদ্ধার হাত থেকে চা নিলেন। সুড়ুৎ করে বৃদ্ধা অদৃশ্য হলেন অন্ধকার অলিন্দে।

এক চুমুক খেয়ে হাঁক দিলেন, এই—

তন্মুহূর্তেই সাড়া না পেয়ে পুনরপি গর্জন করে উঠলেন, এইও—

যেন সুন্দরবনের জঙ্গলে রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার গর্জাচ্ছে।
আতঙ্ক-বিবর্ণ বৃদ্ধা কাছে এলেন।

ক চামচে চিনি দিয়েছ ?

ছয়—

আট চামচে দিতে বলি নি ?

হয় বৃদ্ধা ভুলে গেছেন, কিংবা ইনিই হয়তো বলতে ভুলেছেন।

বাঘের থাবার মতো প্রসারিত বাঁ-হাতে বৃদ্ধার সরু কণ্ঠদেশ মুঠো করে ধরলেন। ডান হাতে চায়ের বাটি ছিল রক্ষা। চায়ে আর এক লম্বা চুমুক দিয়ে অতঃপর বাটি উঁচিয়ে বললেন, বউ মেরে নেতা হয়েছি, তোমায় মেরে নির্ঘাত শহিদ হব এবার।

বৃদ্ধা থর-থর কাঁপছেন।

মনে থাকবে তো ?

অস্পষ্ট স্বরে বৃদ্ধা কি বললেন। ধাক্কা দিয়ে লোকনাথ বাঁ-হাত তুলে নিলেন কণ্ঠদেশ থেকে। কোন গতিকে টাল সামলে সরে পড়লেন বৃদ্ধা।

শ্রবণা ও শুক্লা স্তম্ভিত হয়ে থামের পাশে দাঁড়িয়েছিল। লোকনাথ এতক্ষণে তাকালেন তাদের দিকে। শুক্লার বুকের ভিতর কাঁপছে। শ্রবণা ঘেমে উঠেছে।

বাইরের লোক—বিশেষত অচেনা দু'টি মেয়ের কাছে যথাসম্ভব স্বর মোলায়েম করে লোকনাথ বললেন, কি চাই তোমাদের ?

থতমত খেয়ে শুক্লা বলে, বাড়ির মেয়েরা কোথায় ?

স্ত্রী স্বর্গে গেছেন। মা-জননী আছেন। এই তো এখানেই ছিলেন তিনি। ওমা, মাগো, কারা এসে খুঁজছে তোমাকে—

শ্রবণার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হাতে কি তোমার ?

ফুলের মালা কাগজে জড়ানো ছিল। শ্রবণা সভয়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে বলে, বাতাসা কিনে নিয়ে যাচ্ছি কালীবাড়ি ভোগ দেবো বলে।

মা যেতে পারবেন না। এই সবে চা দিয়ে গেলেন। আটটার মধ্যে না খেলে আমার অম্বল হয়—মায়ের প্রাণ, নিজে তাই তাড়াতাড়ি রান্না চাপিয়েছেন।

আচ্ছা, আচ্ছা। একাই যাব আমরা।

রাস্তায় এসে তারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কৃষ্ণা

গাড়ি ছুটেছে। একলা কৃষ্ণা আর বাপের বাড়ির বহু পূরানো ড্রাইভার। গ্রাম দেখতে বেরিয়েছে সে। শহরে জন্ম, শহরে মানুষ। বিমলের আদিবাস পাড়াগাঁয়ে হলেও ইদানীং সে শহরে কায়েমি হয়েছে, তারও কোনদিন পাড়াগাঁয়ে বসবাসের প্রয়োজন হবে না। পৈতৃক ঘরবাড়ি গাছপালা ও ধানজমি সম্পর্কে এখনো কিছু মোহ আছে, কিন্তু কৃষ্ণা প্রশ্রয় দেয় বলেই টিকে আছে সেটা। শনিবারে শনিবারে দেশে যাওয়া এক ধমকে কৃষ্ণা বন্ধ করে দিতে পারে। শনিবার সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যায়, সোমবার ন'টা বাজতে বাজতে বাসায় ফেবে। সপ্তাহান্তিক অনুপস্থিতিটুকু ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত। কৃষ্ণা কখনো যায় নি তার সঙ্গে। পাড়াগাঁর

সম্পর্কে তার বড় ভয়। ধাবমান রেলগাড়ির জানলা দিয়ে পাড়াগাঁর সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়লেই তার মতে বাঙ্গাল-দেশের আরম্ভ, জল-জঙ্গল বাঘ-কুমীরে ভরা ভদ্রমানুষের বাসের অযোগ্য যে জায়গা। সেই মানুষ আজ পাড়াগাঁয়ে চলেছে একলা। শিয়ালদহ অতিক্রম করে যশোর রোড় ধরে যাচ্ছে।

দাদার মোটরটা নিয়ে চলেছে। রেলগাড়িব চেয়ে মোটরে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাওয়া যাবে। পাড়াগাঁয়ের উপর বিমলের আকর্ষণ কেন, তার একটু ধাবণা পেতে চায়। দুপুরে কলকাতায় ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করবে, সেই আন্দাজে যেখানে যত দূব খুশি চলুক—এই কথা বলে দিয়েছে ড্রাইভারকে।

মনটা খারাপ লাগছে। ছেলেপুলে হয় নি, স্বামীকে নিয়ে সংসার। তারই সঙ্গে গল্পগুজব, সন্ধ্যাব পর কখনো বা হাত-ধরাধরি করে কিছুক্ষণ লেকেব ধাবে বেড়ানো। আট বছবের বিবাহিত জীবনে এই অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে গেছে। বিশ্বভুবনে আব কিছু সে জানে না, জানবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিমল শনিবারে রওনা হয়ে যাবার পর এই দুটো দিন সে দাদার বাড়ি গিয়ে থাকে, ভাজেদের সঙ্গে বেশ আমোদ-স্ফূর্তিতে কেটে যায়, সিনেমায় যায় কখনো .কখনো। বিমল পৈতৃক বাড়ি গিয়ে মুখ বদলে আসে, কৃষ্ণারও মুখ বদলানো হয় ভাইয়ের সংসারে। তাই সে বিমলের দেশে যাওয়ায় আপত্তি করে না। বরং ভালই হয়—পাঁচ দিনের পর দুটো দিন ,ছাড়াছাড়ি হয়ে ভালবাসাব নিবিড়তা যেন নূতন ভাবে অনুভব করে।

কিন্তু এবারের ব্যাপার আলাদা। সোমবারের পর আর তিন দিন কেটেছে, বিমল ফেরে নি। পাড়াগাঁয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে লাভ

নেই, চিঠি দিয়েছে। সে চিঠির উত্তর আসার সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে নি, কাল রাত্রের গাড়িতে সরকার মশায়কে পাঠিয়ে দিয়েছে বিমলের গ্রামে। সারা রাত ঘুমোতে পারে নি, নানা দুশ্চিন্তা বিহ্বল করছে তাকে। সকালবেলা পড়েছে বেরিয়ে। বাইরের হাওয়ায় মন যদি খানিকটা শান্ত হয়।

হু-উ-উ-উ—চলেছে গাড়ি। রাস্তায় মাঝে মাঝে বাধা পাচ্ছে। গরুর গাড়ি হয়তো পথ আটকে আছে, কিংবা হাটুরে মানুষ গজেন্দ্র-গতিতে চলেছে—পথ ছেড়ে সরতেই চায় না। গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পথের ধারে পুকুরে ছেলেরা জল দাপাদাপি করছে, মাঠে নিড়ানি দিচ্ছে চাষীরা, ঠাকুরতলায় গ্রাম-বধূরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজো দিতে এসেছে। সমস্ত আজব লাগছে কৃষ্ণার চোখে।

মাইল-স্টোনে দেখল,সাতচল্লিশ মাইল এসে গেছে। আর নয়, ফিরবে এবার। বাসন মাজছে একটি বউ ঘাটের পাশে বসে। এক নজর দেখে কৃষ্ণা চমকে ওঠে। লীলার মতো মনে হয়। লীলা এখানে? হ্যাঁ, লীলাই তো! এই হাল হয়েছে লীলার!

কৃষ্ণা আন্তরিক দুঃখ বোধ করে। আবার প্রতিহিংসাবৃত্তিও কিছু কিছু চরিতার্থ যেন হচ্ছে তার। এক ক্লাসে পড়ত—সব দিক দিয়ে খাটো ছিল সে লীলার তুলনায়। লীলার চেহারা রাজরাণীর মতো, প্রখর বুদ্ধি-দীপ্তি মুখের উপর। ক্লাসের দিদিমণিরা অধিকাংশ সময় তার দিকে তাকিয়ে পড়াতেন, প্রশ্ন করতেন তাকেই। যেন একমাত্র সে বুঝতে পারলেই হল, সে ছাড়া ক্লাসের মধ্যে আর কেউ নেই। রাগ হত কৃষ্ণার। তার নেভি-ব্লু রঙের অতিকায় মোটরগাড়ি ও নতুন নতুন শৌখিন সাজসজ্জা নিস্প্রভ হয়ে পড়ত লীলার গরিবানার সামনে।

লীলাও দেখেছে তাকে। তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর এসে কলকণ্ঠে সে অভ্যর্থনা করল, কি ভাগ্যি! এস, এস—ঐ বাড়ি আমাদেব। ছেলে অন্নপথ্য করবে, হাঁড়িটা তাড়াতাড়ি মেজে নিচ্ছিলাম ভাত চাপাব বলে।

কৃষ্ণা বলে, এই অবস্থায় তোমায় দেখব স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

লীলা জবাব দিল, আমিও ভাই স্বপ্নেও ভাবি নি—মোটর হাঁকিয়ে এই এদ্দূর চড়াও হয়ে দেখতে আসবে আমাব দুঃখ-কষ্ট। কি করা যাবে বলো! মার্চেন্ট-অফিসের সামান্য কেরানি উনি—ঝি-চাকর রাখবার সামর্থ্য কোথায়?

হাসছে, রাগ করে নি। আর মুখে যত দূর দুরবস্থাব বর্ণনা কবল, তা-ও নয় নিশ্চয়। ঝি আছে। তার উদ্দেশে ডেকে বলল, তোমার আর এক দিদিমণি সারদা—এতটুকু বয়স থেকে আমাদের দু-জনেব বড় ভাব। আমি হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তুমি দিদি, বাকি বাসনগুলো মেজে ফেল।

কৃষ্ণা লজ্জিত হল। সত্যি, এ ভাবে আরম্ভ করা উচিত হয় নি তার। কোন দিন সে জিততে পারবে না লীলার সঙ্গে?

খোকা তিন বছরের। বড় বড় কোঁকড়া চুল পদ্মফুলেব মতো মুখখানা ঘিরে আছে। কলরব শুনে জানলা দিয়ে সে উঁকি দিচ্ছিল।

লীলা বলে, এই দেখ। উঠে এসেছ তুমি? তোমার দুষ্টুমিব জ্বালায় যাই কোথায়? দুষ্টুমি করে জল ঘেঁটে ঘেঁটে জ্বর বাধালে।

নূতন লোক দেখে খোকা ঝুপ:করে বিছানায় পড়ে মুখ লুকায়।

চাঁদ আমার, মাণিক আমার, লজ্জা কেন? মাসিমামণি হই যে তোমার!

বিছানায় এসে কৃষ্ণা জড়িয়ে ধরে খোকনকে। বাপ রে বাপ—ক'দিন জ্বরে ভুগল, তবু জোর দেখ! হাত সরিয়ে দিয়ে দূরে গিয়ে শোয়।

কৃষ্ণা বলে, তোর সন্তান-ভাগ্য দেখে হিংসা হয় লীলা। চোখ-জুড়ানো ছেলে!···ছেলের বাপকে দেখছি না যে?

কালো-কুৎসিৎ বদমেজাজি মানুষ। তাকে দেখে আনন্দ পাবি নে।

মিথ্যে কথা। অমন হেসে হেসে বলতিস না তা হলে। মা-বাপ দুই তোরা সুন্দর। তাই এমন সোনার ছেলে জন্মেছে।

কৃষ্ণা গোপনে দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয়।

লীলা জিজ্ঞাসা করে, তোর ছেলেপুলে ক'টা?

ঘাড় নাড়ল কৃষ্ণা। মুখে বেদনাব ছায়া। তারপর বলে, আচ্ছা মানুষ তুই। বাড়ির কর্তাকে ডাক দে, পরিচয় হোক।

বাজারে গেছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন। এসে আবার কলকাতায় ফিবেন এগারোটাব গাড়িতে। খোকা ভাত খাবে, তাই নিজে গেছেন জ্যান্ত মাছ আর ভাল তরিতরকারি কিছু কিনে আনতে। পবকে দিয়ে হয় না।

পাশাপাশি বিমলের কথা মনে পড়ে যায় কৃষ্ণার। কি কাণ্ডটা হবে, যদি একদিন কৃষ্ণা তাকে মার্কেটিং করতে পাঠায়! অর্ধেক জিনিস আসবে না—বাকি অর্ধেক যা আসবে, সম্ভবত তা সমস্তই ফর্দের বাইরের। তার ভালমানুষ স্বামীকে ঠকিয়ে দেয় ঠগ-জোচ্চোব দোকানদাররা। অকস্মাৎ স্নেহে মন গলে ওঠে নিরীহ অবুঝ মানুষটির জন্য। আবার সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যাওয়া আছে জ্ঞাতি-ভাইদের কাছ থেকে সম্পত্তির হিসাব বুঝে নেবার জন্য। কি মাথামুণ্ডু হিসাব তারা বুঝিয়ে দেয়, কৃষ্ণা সঠিক না জানলেও

অনুমান করতে পারে। এবার থেকে সে-ও দেশ-ভূঁয়ের একটু খবরাখবর নেবে, বিমলকে সাহায্য করবে। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে যে হয়! আর তাকে যেতে দেবে না একা একা। অন্তত‌পক্ষে সরকার মশায়কে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে।

লীলা বলে, তোর বর কেমন হয়েছে—সে কথা বললি না তো কিছু।

মুখে বল্লে কি হবে, চোখে দেখবি। আমাদেব নতুন বাসায় যেতে হবে তোকে। না হয় আমরাই দু-জনে একসঙ্গে একদিন হানা দেবো এখানে। এমন-কিছু দূর তো নয়! পাড়াগাঁয়ে আসতে ওঁর ভারি স্ফূর্তি—গ্রামের ছেলে কি না!

লীলা বলে, আমাদেব উনি ঠিক উল্টো। এখানে যেন জল-বিছুটি মারে। কলকাতায় মেসে গিয়ে না ঢোকা পর্যন্ত সোয়াস্তি পান না।

একটু চুপ করে থেকে বলে, কাবণ অবিশ্যি বুঝতে পারি। ছা-পোষা কেরানির যা হয়। পাজি মনিব—মোটে ছুটি দেয় না। খোকার অসুখে ক'দিন কামাই হচ্ছে, তাই যেন পাগল হয়ে উঠেছেন। সকালবেলা খানিক ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল এই নিয়ে।

কণ্ঠস্বরে বেদনাব আভাস। এতক্ষণের কথাবার্তায় ভব্যতাব ব্যবধান দূর হয়ে গেছে। স্বামীর প্রসঙ্গই চলতে লাগল দু-জনের মধ্যে।

কৃষ্ণা বলে, আমাদের বাবুটিব ঝগড়া করবাবও মুরোদ নেই। সাত চড়ে রা করেন না। তুই বল না ভাই লীলা, পুরুষমানুষের অমন গোবেচারা হলে চলে?

লীলা বলে, অবস্থার গতিকে স্বভাব বদলে যায় ভাই। উনিও কি বদমেজাজি ছিলেন আগে? দশ রকম রান্না করিয়ে মানুষজন

ডেকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। কত খাইয়েছেন! নিজেও খেতেন খুব। এখন সব গেছে। সাধ্য নেই, সময়ও নেই।

কৃষ্ণা বলে, আমাদের উনি? পাখীর আহার—বকে-ঝকে যা ছুটো খাওয়াতে পারি। আর্টিস্ট লোক—এমন সুন্দর সুন্দর সব ছবি আঁকেন! ধূলো আর যেসব মানুষ ধূলো ঘাঁটে, তাঁদের উপর ওঁর বিষম ঘৃণা।

বিমলের এক বেয়াড়া অভ্যাসের কথা মনে পড়ে কৃষ্ণা টিপি-টিপি হাসতে লাগল। বলে, পৃথিবী ধূলোর না হয়ে কার্পেটে মোড়া হলে ভাল হত ওঁর পক্ষে। কি রকম ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটেন, সে যদি দেখিস! দেশের উপর এত টান—কিন্তু যাবার সময় এই গরম কালেও ফুল-মোজা এঁটে গিয়েছেন।

কথাবার্তায় ছেদ পড়ল।

ঐ যে—বাজার থেকে এসে গেলেন। গল্পে গল্পে ভাত চাপানো হয় নি, সর্বনাশ!

লীলা রান্নাঘরে ছুটল। খালি গা—বিমল কাঁধের ঝুড়ি আর ডানহাতে-ঝোলানো মাছের খালুই নামিয়ে দাওয়ায় রাখল। কয়েকটা সিঙিমাছ খলবল করে উঠল খালুয়ের মধ্যে।

লীলা বলে, অনেক দেরি করে ফেললে—

খানিকটা তেল মাথায় থাবড়ে বিমল বলে, দশটা বেজে গেছে। একটা বেগুন পুড়িয়ে দাও, ব্যস—হয়ে যাবে।

কৃষ্ণা বাইরে এল। নিস্তব্ধ। ঝড়ের আগেকার থমথমে ভাব

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সামলাবার চেষ্টা করছে কৃষ্ণা। তারপর কথা বলল—অতি শান্ত কণ্ঠ। বলে, এগারোটার গাড়ি যায় যাকগে।

আমার মোটর হয়েছে। খোকামণি অন্নপথ্য করবে, তার খাওয়া আগে হয়ে যাক। তিন দিন কামাই হয়েছে, আর একটা দিনে চাকরির এমন ক্ষতি হবে না।

রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বলে, লীলা ভাই, তোর বাড়ি খাব কিন্তু আমি। কলকাতা ফিরতে অসময় হয়ে যাবে। তোর কর্তাকে গাড়িতে নিয়ে যাব, নিয়ে ওঁর মেসে পৌঁছে দেব।

কন্ট্রোল-আমলে

রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন—

দাঁড়িপাল্লা ধরে নিজের হাতে এক সের দু-সের চাল-ডাল নুন-তেল বিক্রি করি দাদা। আর দ্বিজবর পালিত দোমহলাব উপব দেখুনগে গড়গড়া টানতে টানতে খবরের কাগজ পড়ছে। দ্বিজবর ইংরেজি কাগজ পড়ে—বুঝুন! বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘণ্টাখানেক সে কাগজখানার এপাতা-ওপাতা উল্টাবেই। খাতিব বাড়ে ওতে জনসমাজে।

দ্বিজবর হয়তো ভালো করে আমায় চিনতেই পারবে না, কিন্তু একদা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম আমরা। এক মহাজনের গদিতে একসঙ্গে ছিলাম, তারপর বেরিয়ে এসে একই পট্টিতে দুই দোকান ফেঁদে বসেছি। লড়াই আর দুর্ভিক্ষের দরুন দেখতে দেখতে দোকান জেঁকে উঠেছে। দোকানেব পাশে ভাঁট-আশশ্যাওড়ায় আচ্ছন্ন পতিত জায়গাটুকু প্রায় তীর্থভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে, অহরহ মানুষ ধন্না দিয়ে থাকে সেখানে। ভাদ্রমাস—টিপটিপে

বৃষ্টি লেগেই আছে, তা বলে কিছুতে কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। সকালবেলা পাঁচ আনা দরে এক সের হিসাবে চাল দেওয়া হয়, শেষ রাত থেকে লাইন দিয়ে বসে আছে তার জন্য।

বারো বস্তা করে আমার দৈনিক বরাদ্দ। সপ্তাহের মাল এক সঙ্গে পাই, সাগুড় বোঝাই করে গুদামে এনে তুলি। সকালবেলা বিক্রির সময় কনেস্টবল এসে দাঁড়ায়, সিভিক-গার্ডরা আসে, একজন ইন্সপেক্টর বস্তা গুণে দেখে হুকুম করেন চাল ঢেলে ফেলতে। স্তূপীকৃত চালের দিকে চেয়ে কিউয়ের ভিতরে প্রত্যাশীগুলোর চোখ চকচক করে ওঠে। মাপ করে দিতে আর পয়সা গুণে নিতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যায় দোকানের মানুষ। শেষ হতে বারোটা-একটা বেজে যায়। তখন দেখতে পাবেন, পাশের জায়গাটায় অসংখ্য ইট-পাটকেল আর বাঁশের টুকরো ছড়ানো। না দাদা, সে সব কিছু নয়—না খেয়ে মানুষ মরছে, তা বলে মারামারি করতে যাবে কেন? ঐ ইট-পাটকেল হল ওদের বসবার আসন, জায়গার নিশানা। একটা-কিছু টেনে নিয়ে তার উপর বসে বসে শেষরাত্রি থেকে বৃষ্টিবাদলার ভিতর ঝিমোয়।

ইন্সপেক্টর বাবুটি মিশুক লোক—নাম পরিতোষ চক্রবর্তী। এখানকার সিনেমায় গেটম্যান ছিলেন আগে, গুণ্ডা ঠেকাতেন। বস্তাগুলো গুণে দিয়ে আমার গদির কোণে তিনি বসে পড়েন।

কি মশায়, চা-টা খাওয়াবেন তো দেখুন—

ছুটে একজন গিয়ে বিপিন ময়রার রসগোল্লার রসে তৈরি চা নিয়ে আসে। গল্পগুজব চলে। সন্ধ্যার সময়ও এক একদিন তিনি আসেন, দ্বিজবর আসে। পাশার ছক পেতে চতুর্থ লোকের জন্য নবীন সরকারের কাঠগোলায় খবর পাঠাই। নবীনকে বরাবর দেখে আসছি পাশার নামে পাগল। ইদানীং কি হয়েছে—

খেলতে বসে কেবলই উস্‌খুস করে, একটা বাজি কোন রকমে শেষ করে নানা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যায়।

দ্বিজবর বলে, কেন ডাকাডাকি কর? তিন হাজার খাটের অর্ডার পেয়েছে, তিরিশ জন মিস্ত্রি খাটাচ্ছে। মরবার সময় আছে ওর?

চক্রবর্তীর গা টিপে আমি বললাম, দেখে আসুন গে একবার গোলার ভিতর ঢুকে। আমকাঠের পায়ায় চার ফালি করে তক্তা জুড়ে আহা-মরি খাট বানিয়ে বানিয়ে রাখছে। ওর উপরে নেয়ার বোনা হবে, সৈন্যেরা শোবে নাকি তার উপর। নেয়ারের ভারেই মশায় খাট ভেঙে পড়বে, সৈন্য ওঠার সবুর সইবে না।

দ্বিজবর স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলো কি—দেখে নিচ্ছে না উপরওয়ালারা?

চক্রবর্তী বললেন, বন্দোবস্ত রয়েছে। আমকাঠ শাল-সেগুন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বন্দোবস্তর গুণে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্বাস ফেলেন কেন? স্রেফ তোড়জোড়ের ব্যাপার। যে যেমন বাগিয়ে নিচ্ছে। পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে বাজারে—ধরে নেবার কায়দা খুঁজুন।

দ্বিজবর আহত কণ্ঠে বলে উঠল, কাজ নেই ভাই, বেশ আছি। ধর্মের কড়ি—না হয় এক বেলা আধপেটা খেয়ে দোকান চালাব।

সপ্তাহের প্রণামী চক্রবর্তী একদিনে হিসেব করে নেন। এবারে বেঁকে বসলেন, রেট না বাড়ালে চলবে না। নবীন সরকার কত করে দিয়ে থাকে জানেন?

কাতর হয়ে বললাম, পেটে খেলে পিঠে সয়। আমাদের পোড়া ব্যবসায়ে আমকাঠ তো সেগুন বলে চালানো চলে না।

চক্রবর্তী বললেন, ঐ এক জিনিষ দেখে এসেছেন—সেইটেই শুধু ধরে আছেন। গলিঘুঁজি অনেক রকমের আছে—বুদ্ধি করে পথ

খুঁজে নিতে হয়। সত্যযুগের মানুষ আপনারা—কিচ্ছু হবে না আপনাদের দ্বারা।

ব্যঙ্গের দৃষ্টি হেনে চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন। খপ করে তাঁর হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরলাম।

তিনি বলেন, করছেন কি? সরকারি মানুষ আমি, ওঝা হয়ে ঝাড়তে এসেছি। বিষের খবর দেওয়া উচিত হবে কি আমার? না, না—ওসবের মধ্যে আমি নেই।

একরকম টানতে টানতে তাঁকে পিছনে গুদাম-ঘরের ভিতর নিয়ে গেলাম। বিপিন ময়রার দোকান থেকে শুধু চা নয়—রসগোল্লাও এল। বেরুবার মুখে খান পাঁচেক নোট গুঁজে দিলাম চক্রবর্তীর পকেটে।

পরদিন থেকে—চুপি চুপি বলছি দাদা, বাজারে যেন চাউর হয়ে না পড়ে—রাত্রে ফিরবার সময় মুটে আমার পিছু পিছু দু-বস্তা করে চাল বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। সকালবেলা বারোর জায়গায় দশ বস্তা মাল বেরোয়, চক্রবর্তী গুণে গেঁথে ঠিক আছে বলে রায় দেন। বস্তা কেটে চাল ঢেলে ফেলা হয়। অতিরিক্ত খালি দুটো বস্তা পাশে পড়ে থাকে। কোন অফিসার যদি হঠাৎ এসে পড়ে, কিম্বা চাল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার দরুন খদ্দেরের ভিতর থেকে তেরিয়া মেজাজের কেউ এসে দেখতে চায়, গুণে দেখবে ঠিক আছে—বারো বস্তাই।

বেশ চলল ক'দিন। কিন্তু ঘরশত্রু বিভীষণ রয়েছেন। সদরে যাব বলে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছি, উঠানে পা দিয়ে পাথর হয়ে গেলাম। রাত্রিবেলা আমি দাদা, টিপি-টিপি বস্তা এনে জমাই—আর সকালে আমার দোকানে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে উনি বস্তার মুখ কেটে সদাব্রত শুরু করে দেন। দস্তুরমতো লাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে

বাড়িতেও। আপাতত কোন গতিকে উঠানের মধ্যে ঝুলিয়ে গেছে। কিন্তু খ্যাতি ছড়াতে দেরি লাগবে না। উঠান ছাড়িয়ে লাইন রাস্তায় পৌঁছল বলে। আর পাড়ার মধ্যে সার্কেল-অফিসারের বাসা—স্ত্রীর দানশীলতার পুণ্যে টুঁটি চেপে অচিরে তিনি আমার কাঠগড়ায় তুলবেন, সন্দেহ নেই।

খুব খানিকটা বকাবকি করে নিজেই শেষটা হাঁপিয়ে পড়ি। চক্রবর্তীকে বলি, সত্যি বলেছেন মশাই। সত্যযুগের মানুষ—পোড়া অদৃষ্টে কিছু হবে না। আপনার আগের প্রণামী বহাল হল আবার।

বেশ, বেশ! সাচ্চা কাজই তো ভালো—

বলে মুখ কালো করে চক্রবর্তী তারিফ করতে লাগলেন।

সদরে আমাদের নিয়মিত দর্শন দিয়ে আসতে হয়, নইলে সেখানকার দেবতারা রুষ্ট হন। স্টেশনে নেমে এবার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। তারপর মনে পড়ে গেল, আকাশভেদী দেয়ালের মতো হয়ে ছিল প্লাটফর্মের দক্ষিণ দিকটায়। মাস চারেক ধরে অসংখ্য বস্তা সাজিয়ে রেখেছিল—সে সব সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাই অমন লাগছে।

গেল কোথায় বলুন তো? টিকিটবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম।

নিলাম হয়েছিল। তুলসীরাম মাড়োয়ারি জলের দরে কিনে নিয়েছে।

সোনার দামে চাল বিকোচ্ছে, জলের দাম কি জন্য?

বৃষ্টিবাদলা খেয়ে মাল লাট হয়ে গেছে। এ চাল খাওয়া যাবে না, কোন কাজেই আসবে না।

টিকিটবাবু আদার ব্যাপারি—একটা মাছ, দুটো কাঁচকলা কিম্বা নগদ দু-আনা চার-আনার কারবার করেন—তিনি বলে দিলেন, কোন কাজে আসবে না। কাজে আসবে না তো

তুলসীরাম পয়সা দিয়ে কিনে তার উপর আবার পয়সা খরচ করে সরিয়ে নিয়ে গেছে কেন? যাই বলুন—চক্রবর্তী আমার গুরু এ পথে, মনের উপর থেকে বিবেকের পাষাণ-ভার তিনি সরিয়ে দিয়েছেন। তুলসীর সঙ্গে দেখা করলাম, কথাবার্তা হল। আপাতত এক চালান পাঠিয়ে দেবে আগামী রবিবারে। অন্ধকারে আমার গুদামঘরের নিচে গিয়ে নৌকো লাগবে, মাল বদলাবদলি হবে—যত বস্তা উঠবে, ঠিক তত বস্তা বেরিয়ে আসবে তুলসীর নৌকোয়।

খুশি হয়ে ফিরলাম। চক্রবর্তীর তোয়াক্কা রাখি না। স্ত্রী-রত্নটিকে নিয়ে সামাল-সামাল হতে হবে না, অফিসারদের যার যখন ইচ্ছা গুদামে ঢুকে বস্তা গুণে চলে যাক। মোক্ষম বুদ্ধি বের করেছি।

যে মাঝির নৌকোয় আনা হবে, তার সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এলাম। মাঝি বলেছিল, বড্ড কড়াকড়ি লাগিয়েছে, আপনাকে কিন্তু সঙ্গে যেতে হবে বাবু। পাকুড়তলার বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেখান থেকে তুলে নেব। আপনি সঙ্গে না থাকলে গঞ্জের ধারে নৌকোই লাগাব না মোটে।

অতএব প্রহর দেড়েক রাত্রে রওনা হয়ে পড়লাম। মাঝি বলেছিল, দেড়-পো জোয়ার হয়ে যাবে পৌঁছুতে। তার মানে, পাকুড়-গাছের দো-ডালা অবধি জল উঠে যাবে। পাকুড়-ছায়ায় বাঁধের উপর চুপচাপ আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে খর-স্রোত নদীর উপর নজর রেখে। বাতাস থাক বা না থাক, পাল তুলে যাবে সেই নৌকো। দাঁড়গুলো তোলা থাকবে ছইয়ের উপর, শুধুমাত্র হাল বাইবে।

মাঝি বলেছিল, নৌকো দেখলেই অমনি হাঁক পাড়বেন বাবু। ভয় করবেন না, খুব জোরে হাঁক দিয়ে বলবেন, পার করে দাও ও মাঝি, জলমার হাটে যাব। জলমার হাট—কথাটা মনে থাকে

যেন। জবাব আসবে, গোন বয়ে যাচ্ছে, পারব না। আপনি বলবেন, ন্যায্য পারানি দেব—মাংনা নয়। টাকা-পয়সার কথা নয় বাবু, বলবেন পারানি।

তাই সই, মুখস্থ করে নিয়েছি কথাগুলো। প্রক্রিয়াটা আদ্যন্ত আওড়াতে আওড়াতে যাচ্ছি। মনের উদ্বেগে সকাল সকাল বেরিয়েছি। জোয়ারের দেরি আছে। স্টিমার-ঘাট এখানটায়—লড়াইয়ের জন্য স্টিমার বন্ধ। ঘাটের লোহালক্কড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে। কত দোকান-পাট ছিল—চালাগুলো রয়েছে, একটিমাত্র লোক থাকে শুধু এখন। রান্না করছিল সে। ক্ষ্যাপাটে মানুষ—ত্রি-সংসারে কেউ নেই, ঠিকমতো জ্বাল দিতেও পারে না। চালের বাখারি টেনে টেনে উনুনে দিচ্ছে। ভিজে বাখারি বড় ধোঁয়াচ্ছে। গান ধরছে লোকটা মাঝে মাঝে। নির্জন ঘাটের ধারে উনুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে তার ভারি স্ফূর্তি—

কলসি কাঁখে কমলিনী জল আনিতে যায়,
সীমন্তে সিঁদুর শোভে নূপুর শোভে পায়—

বসে আছি আমি একলা পরিত্যক্ত এক পান-বিড়ির দোকানের সামনে বাঁশের মাচার উপর। সাড়াশব্দ দিচ্ছি নে। স্টিমারের কত মানুষ এখানে পা ঝুলিয়ে বসে বসে বিড়ি টানত!

তারপর চাঁদ ডুবে গেল। জোয়ার এসেছে, জল ছলাৎ-ছলাৎ করে পাড়ের উপর এসে পড়ছে, এক-একবার পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমার। মেঘ ঘন ঘোর হয়ে আকাশে জমে উঠল। মিশকালো অন্ধকার। চলেছি ডাল-পালা মেলানো অদূরের পাকুড়গাছ লক্ষ্য করে। আগুন···দপ করে ডানদিকে জ্বলে উঠল। শ্মশান এটা। চিতা জ্বলছে, কিন্তু লোকজন কোথায়? ভাগ্য ভাল মানুষটার—ঠাণ্ডা বর্ষা-রাত্রে আরাম করে আগুনে পুড়ছে। শ্মশান-বন্ধুরা কায়ক্লেশে

চিতা জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়েছে। আকাশে যে মকমুটা আয়োজন করে আসছে—নিশিরাত্রে সাধ করে কে বাদলায় ভিজতে চায়? বাতাস উঠেছে, নিভন্ত চিতা বাতাসের ঝাপটায় জ্বলে জ্বলে উঠছে। রক্তলোলুপ আলেয়া যেন মুখ খুলছে ঘাড় মটকাবার জন্তে। কিম্বা মরা মানুষটাই হা করছে খাদ্যের লোভে, জঠরের আগুন লক-লক করে বেরিয়ে আসছে সেই সময়।

আশেপাশে হাড়পাঁজরা ছড়ানো। নৌকো···নৌকোই তো—পাল-তোলা নৌকো ঐ যে!

পার করে দাও, ও মাঝি—

যথারীতি জবাব এল, লাবব—গোন বয়ে যাচ্ছে।

চমকে উঠি—লোম খাড়া হয়ে ওঠে শজারুর কাঁটার মতো। চিতার আলোয় দেখলাম, পাক দিয়ে এক মাথার খুলি আমার দিকে ফিরল। উলঙ্গ দু-পাটি দাঁত মেলে ভয় দেখাচ্ছে। আসছে গড়াতে গড়াতে, এগুচ্ছে আমাব দিকে। নদীকূল ছেড়ে দ্রুত বাঁধের উপর উঠে দাঁড়াই। পা কাঁপছে ঠক-ঠক করে। ফিবে তাকিয়ে দেখি, মাথার খুলি আমায় লক্ষ্য করে গুটি-গুটি আসছে তখনো।

একটা গর্ত মতো জায়গা—সেইখানে খুলিটা উলটে গেল। বড় এক কোলাবেঙ বেরিয়ে এল, আটকে গিয়েছিল কি কি রকমে।

মাঝি, মাঝি—

নৌকো তখন অনেক দূব এগিয়ে গেছে।

ও মাঝি!

ডাকতে ডাকতে পাগলের মতো কূল বেয়ে ছুটলাম। নৌকো বাঁক পেরিয়ে আড়াল হয়ে গেল।

গোটা মানুষ জ্যান্ত অবস্থায় কিছু করল না, আর করোটিখানা আক্রোশে তেড়ে আসছে—এমন হাস্যকর কল্পনা কি করে সেদিন

মাথায় এল বুঝতে পারি না। যা বলেছিলেন চক্রবর্তী, অকেজো সত্যযুগের মানুষই বটে! তুলসীরামের কাছে গিয়ে তারপর অনেক ধরা-পাড়া করেছি। সে মাথা নেড়ে বলল, উপায় নেই—লটসুদ্ধ বিক্রি হয়ে গেছে, আরো ভালো দাম পেয়েছি।

তখন জানতে পারি নি—সম্প্রতি তুলসীর এক কর্মচারীর কাছে শুনলাম, কিনেছিল আমাদের দ্বিজবর। আজ দোমহলার উপর পা ঝুলিয়ে সে খবরের কাগজ পড়ে, আর আমি দাড়ি-পাল্লা ধরে একসের দু-সের চাল-ডাল বিক্রি করছি। শুনছি নাকি, আবার লড়াই বাধবে, জবর দুর্ভিক্ষও আসতে পারে? খাঁটি খবর তো দাদা, না আমার কপালে শেষ পর্যন্ত ঝুটো হয়ে দাঁড়াবে?

লঙ্গরখানা

(১)

ভাত দাও মা চাড্ডি।

ওরে হারামজাদা গোবিন্দ, কানে যাচ্ছে না?

উঠোনের দিকে ঝুঁকে গোবিন্দ বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে বাপু? বোস। নিয়ে যাচ্ছি।

উঁহু, এখানে নিয়ে আয়। ভাত নয়—ফ্যান।

গোবিন্দ ফ্যান নিয়ে এল।

গরম আছে তো? ঢেলে দে বেটাদের মাথায়। এত খাওয়াচ্ছি—তবু ডাকে, 'মা'—'মা'—'মা'! মুখস্থ করে এসেছে!

(২)

নমিতা শুনে হেসেই খুন।

ভাত জুটছে না, আর এখন ফ্যান চালাচ্ছে? লাগাও খিচুড়ি আমাদের এখানে, সঙ্গে মাছ-ভাজা।

খবর পৌঁছে গেল। রক্তচক্ষু সুবল বলে, বটে! লাগাও এখানে পোলাও-কোপ্তা-কাবাব। মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই গোবিন্দ, পোলাও-কোপ্তা-কাবাব—চেঁচিয়ে বলবি। দেখি কে যায় ও-বাড়ি!

(৩)

তবু যাচ্ছে বাবু।

আগুন হয়ে সুবল বলল, তুইও যা চলে—

গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে। গলা খাটো করে সুবল বলল, চুপিচুপি ওদের মধ্যে বসে দেখে আয়, কেমন খাওয়াচ্ছে।

ফিরে এসে গোবিন্দ বলে, ভাঙা-মুসুরি, ইয়া মোটা-মোটা চালের খিচুড়ি আর কুচোচিংড়ি-ভাজা। থুঃ—

তবে মানষে যায় কেন আমাদের পোলাও ছেড়ে?

হেসে হেসে কথা বলে কিনা! ছিংসুটে মেয়ে বাবু, কিন্তু হাসিটা ভারি মিষ্টি।

(৪)

কাজকর্ম চুকে যাবার পর গোবিন্দ অদৃশ্য হয়েছে ইদানীং। রাগে বাগে সুবল চলে গেল নমিতার ওখানে।

হাতে বালতি, গোবিন্দ খিচুড়ি পরিবেশন করছে।

নমিতা বলে, সমস্ত চুকে গেছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া এইবার। বারান্দায় জায়গা হয়েছে, বসে যান।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুবল পা বাড়াল।

না খেয়ে যাবেন, সে হবে না। গেট বন্ধ কর, এই রামদীন।

রামদীন পৌঁছবার আগে নিজেই নমিতা ফটক আটকে দাঁড়াল।

শুধু হিংসুটে নয়, দস্তুরমতো মিলিটারি মেজাজ মেয়েটার। খাওয়াচ্ছে সামনে বসিয়ে—যেন জঙ্গিলাট বাহাদুর হুকুম চালাচ্ছেন এক হাবিলদারের উপর।

(৫)

সন্ধ্যাবেলা কেউ যখন নেই, সুবল আবার গেল।

দেখুন, একটা পরামর্শ হওয়া উচিত। সেইজন্য এসেছি। কম-পিটিশনে দু-পক্ষেরই লোকসান।

নমিতা বলে, লঙ্গরখানা আপনি একাই চালান। আমি বন্ধ করে দেব ভাবছি।

টাকাকড়ি ফুঁকে গেল ?

উল্টে হাজার দশেক দেনা। নালিশ করেছে। আদালতের সমন দিয়ে গেল এই।

সমন পড়ে দেখে, মামলার মাসখানেক বাকি।

(৬)

ভিখারি-ভোজন তুলে দিলে নাকি, সুবল ?

একজনকেই দিয়ে দিলাম যা ছিল সমস্ত।

ভিতরে আসতে বোমার মতো ফেটে পড়ল নমিতা।

লোকের কাছে আমায় ভিখারি বলছ ?

নমিতার মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া।

দাঙ্গার একটি কাহিনী

হাসপাতাল। পাশাপাশি দুটো বেড। এক ছোকরা আর এক বুড়ো রোগি—খুব ভাব হয়ে গেছে দু-জনের মধ্যে। কথাবার্তা হচ্ছে।

ছোকরা বলে, চাষবাসের অবস্থা ভাল না। এক ফোঁটা পানি নেই, ভুঁই-ক্ষেত চৌচির হয়ে আছে। শুনলাম, পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে এবার—মোছলমান হলেই একটা না কাজে লাগিয়ে দেবে। ঘরবাড়ি ছেড়ে সেই লোভে বাবু শহরে চলে এলাম। এসে এখন এই হাসপাতালে।

বুড়ো লোকটি বলে, আহা, ঘর-বাড়ি আমারও ছিল, বাগবাগিচা-পুকুর সমস্ত ছিল, অনেক দিন খোঁজখবর রাখি নে। মাঝে মাঝে বড্ড ইচ্ছে হয় গাঁয়ে গিয়ে থাকতে। হবার জো নেই। কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলো, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। নইলে একটা দিনও থাকি পোড়া শহরে! সুন্দরবনের চেয়ে সাংঘাতিক হয়েছে কলকাতা, এ আর মানুষের বসবাসের মতো নেই।

বাড়ি কোন্ গাঁয়ে মুরুব্বির ?

অনেক দূর। হরিহর গাঙের উপর—কেশবপুর গঞ্জের নাম শুনেছ ?

হাঁ, হাঁ। গাঁয়ের নামটা বলেন।

রায়পাশা। চেনো ?

চিনি নে ? হরিহরের আড়পারে হল আমাদের বাড়ি—খানপুর।

আহা-হা, কি জল গাঙের! দশ হাত জলের নিচের পাটা-শেওলা আর বালিমাটি দেখা যেত। এখন আছে সেই রকম? ছেলেবয়সে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে তোমাদের খানপুরে যেতাম শেয়াকুল খেতে। সুতোয় কুচোচিংড়ি বেঁধে গাঙের ধারে ধারে কাঁকড়া ধরে বেড়াতাম।

সব যেন উড়ে-পুড়ে গেল। আমরাও বাবু কত দেখেছি! তরিতরকারি কেউ পয়সা দিয়ে কিনত না। এখন সজনের খাড়া বিক্রি হচ্ছে পয়সায় দু-গাছা করে।

ঘোর কলি! ধর্ম দেশ ছেড়েছেন। এই দেখ না কেন—আগে একটা খুনখারাপি হলে অঞ্চলময় তোলপাড় পড়ে যেত, এখন দিন দুপুরে শহরের বুকের উপর কচু-কাটা করছে।···পিঠের উপর ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল, আর ইঞ্চিটাক ঢুকে গেলে আজকে এই শুয়ে শুয়ে গল্প করতে হত না তোমার সঙ্গে।

ছোকরাটি আন্তরিক দুঃখিত হয়ে বলে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন বাবু। ছোরা মেরেছে—নজর রেখে চলাচল করলে ছোরায় তেমন বেকায়দা করতে পারে না। আমার দেখেন বন্দুকের গুলি। পঞ্চাশ হাত দূর থেকে দেওড় করল, মুখ থুবড়ে পড়লাম ট্রাম-রাস্তার উপর।

সর্বরক্ষে বাবা, হাঁটুতে লেগেছে—বুক কি কপাল ফুটো করে দেয় নি।

চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে বাবু। কাজের চেষ্টায় এসেছিলাম, খোঁড়া মানুষকে কে কাজ দেবে? লাঙল চষব, ক্ষেত-খামারের কাজ করব, সে উপায়ও আর রইল না।

আমার চাকরিটাও গেল এইবার বাবা। বয়স হয়েছে, ম্যানেজারের মন জুগিয়ে টিঁকে ছিলাম কোনক্রমে। এর পর আর উঠে আমায় দশটা-পাঁচটা আপিস করতে হবে না। তোমার তবু

যাই হোক গ্রামে একটা আস্তানা আছে—হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আমি যে কোন্ চুলোয় গিয়ে উঠব, ভেবে পাই নে। বাপ-দাদারা ঘর-বাড়ি করেছিলেন—ভিটের উপর এখন নাটার জঙ্গল হয়ে আছে শুনতে পাই।

বাপ-দাদার ঘর না থাক, উঠবার জায়গার অভাব হবে না বাবু। তাই চলেন, এক জায়গার মানুষ—কলকাতার খুরে সেলাম দিয়ে একসঙ্গে বেরুই। আমাদের দলিচঘরে থাকবেন, ঢেঁকিশালে রান্নাবান্না হবে। দু-মাস ছ-মাস স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। ধীরে সুস্থে ঘরদুয়োর বেঁধে নেবেন নতুন করে। আমরা খানপুরের সর্দাররা আর রায়পাশার মিত্তিররা আলাদা ছিলাম না কোনকালে।

তা সত্যি। লক্ষ্মীপূজোর পরদিন বাবা সর্দারদের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াতেন। ছেলেবেলা বরাবর দেখে এসেছি। তোমাদের বিয়ে-থাওয়ায় বরযাত্রী যেতেন কর্তারা। দস্তুরমতো সমাজ-সামাজিকতা ছিল। আজকে সব উঠে গেছে।

উঠে গেছে কে বলল? শহরে এসেই শোনা যায়। ভাবি, আমাদের মতোই বুঝি সকলে। তারা ঠিক আছে, মরেছি বাবু আমরা।

* * *

অফিস-ঘরে থানা-অফিসার আহত দু-জনের খবর নিতে এসেছেন। হাউস-সার্জনকে বলছেন, করেছেন কি ডাক্তার বাবু, পাশাপাশি বেডে দিয়েছেন? ছোকরা ঐ বুড়ো লোকটিকে ছোরা মারে; মিলিটারির গুলিতে ছোকরাও জখম হল সঙ্গে সঙ্গে। একসঙ্গে দু-জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্বাধীন ভারতে

হরিপদ বাঁড়ুয্যে মিনিস্টার হয়েছেন। জেল দেখতে গেছেন। জেলের সঙ্গে অনেক পুরোনো সম্পর্ক। এক-একবার যখন বেরিয়ে আসতেন, কয়েদিরা সসম্ভ্রমে নমস্কার করত।

খবর কি পাঁচু?

এবারে যখন আসবেন বাবু, আমি যেন রান্নার কাজটা পাই। এরা হাড় জ্বালিয়ে খেল। বছির আকলু নীলকেষ্ট—সবাই পেয়েছে, আমার ভাগ্যে জুটল না।

আর কদ্দিন বাকি আছে তোর?

দশ বচ্ছর। তার মধ্যে কতবার আপনারা আসা-যাওয়া করবেন বাবু!

সেই হরিপদ জেল দেখে বেড়াচ্ছেন আজকে। জেলার 'আজ্ঞে, আজ্ঞে—' করে পিছনে হাত কচলে বেড়াচ্ছেন।

হরিপদ বলেন, ভাল আছেন রায় সাহেব?

ও আর. বলবেন না স্যার। রায় সাহেব উপাধি ছেড়ে দেব। বিদেশির দেওয়া উপাধি নামের সঙ্গে জুড়তে অপমানে গা জ্বালা করছে।

কিন্তু বিশ বছর ধরে ভোগ করে আসছেন, এখন শুধু হারাণ বাবু বললে চিনতেই পারবে না লোকে।

পারবে স্যার, খুব পারবে। দু-শ বছরের বৃটিশ-ভারত রাত বারোটায় স্বাধীন-ভারত হল, সাদা সাহেবগুলো কালা-আদমিদের

তোয়াজ করে বেড়াচ্ছে—সবাই সব পারছে, আমি পারব না? হারাণ মজুমদার হয়ে দিব্যি খদ্দর পরে বেড়াব, দেখতে পাবেন।

তারপর খোশামুদির হাসি হেসে বলে, আঙুল ফুলে স্যার শালগাছ হয়ে গেল, দেশি মানুষ সব লাট-বেলাট হয়ে যাচ্ছে—বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না?

কি চান?

প্রমোশান। দিয়ে দেখুন, আপনাদের ঠেঙিয়েছি—সাহেবগুলোকে কি করে ঠেঙাই এবার!

পাঁচু সেখানে ছিল। সে বলে, না বাবু, চোর বলে কয়েদে পুরুন ওদের। ঠেঙিয়ে নিয়ে বেড়াব আমরাই। আমরা হলাম ধরুন ভাইব্রাদার—এক জেলে বরাবর কাটিয়ে এসেছি।

মুখস্থ বক্তৃতা

উনিশ শ' সাত সালের কথা।

একটা ধুতি টাঙানো ছিল হরসুন্দরের উঠানে। ধুতিটা বিলাতি। ছেলেরা সেটা নিয়ে গিয়ে আগুনে ফেলে দিল। হরসুন্দরের সম্বন্ধী-পুত্র বলাই বারম্বার নিষেধ করেছে, কেউ তা কানে নেয় নি। গ্রামের সব বাড়ি থেকেই এমনি বিলাতি কাপড় জড় করে আগুন দিয়েছে।

কিন্তু সব বাড়ির মানুষ আর হরসুন্দর এক নন। গ্রামের তালুকদার তিনি—সবাই তাঁর প্রজা। বলাইর মুখে আদ্যন্ত শুনে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামের প্রান্তে বিলের ধারে তাঁবু খাটিয়ে আছেন পাখি-শিকারের জন্য। হরসুন্দর ইতিমধ্যেই মুর্গি, মর্তমান কলা ও ভাঙা হিন্দি সহযোগে

সেলাম দিয়ে এসেছেন একবার। সাহেবের কাছে ছুটলেন তিনি। ভাঙা হিন্দির সম্বলে এত কথা বোঝানো যাবে না, সেজন্য ইংরেজি-নবিশ সুহৃদ হৃষীকেশ-দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সাহেব মামলা সম্পর্কে হ্যাঁ-না কিছু বললেন না, কিন্তু হরসুন্দরকে খাতির করলেন। এটা সম্ভবত হৃষীকেশকে সঙ্গী করে আনার দরুন। হরসুন্দরের অবোধ্য অনেক কথা সে ইংরেজিতে বলল—হরসুন্দরের প্রশংসা নিশ্চয়ই। নইলে এত অধিক সমাদব কেন? কিছু না খাইয়ে ছাড়বেন না। হরসুন্দরের ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমে তিনি সাহেবকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে অনেক বলে-কয়ে এবং হৃষীকেশের সুপারিশে তাঁবুব বাইরে এসে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন।

একেবারে মুক্তি পান নি কিন্তু। ক'দিন পবে ডাক পড়ল তাঁবুতে। তারপর প্রায় প্রতিদিনই।

সাহেব বললেন, আপনি এমন চমৎকার মানুষ! আপনার এলাকায় 'বন্দে মাতরমের' হামলা—আমার বিস্ময় লাগছে।

হরসুন্দর গদগদ কণ্ঠে বললেন, হুজুর সীসা গলিয়ে যদি কানেব মধ্যে ঢেলে দেন, সে বরঞ্চ সইতে পারব—কিন্তু 'বন্দে মাতবম্' শুনলে পিত্তি-নাড়ি অবধি জ্বলে ওঠে। প্রতিকারের জন্যই তো এসে পড়েছি হুজুরের চরণে।

হৃষীকেশ-দারোগা ইংরেজিতে নয়—এবারে হিন্দি-বাংলায় মিশিয়ে প্রস্তাব করলেন, এই গ্রামে স্যারের শুভ-পদার্পণ উপলক্ষে হরসুন্দর বাবু একটা সম্বর্ধনা-সভা করতে চান। স্যার যদি এই উপলক্ষে নির্বোধ প্রজা-সাধারণকে আন্দোলনের কুফল বুঝিয়ে দু-দশ কথা বলেন—

সাহেব সম্মত হলেন। হরসুন্দরের পিঠ চাপড়ে বললেন, যদিও তিনি সম্পূর্ণ বে-সরকারি সূত্রে এখানে এসেছেন, হরসুন্দরের মতো

রাজভক্ত সজ্জন মানুষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কিছুতে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—

সম্বর্ধনার প্রস্তাব কিন্তু হরসুন্দরের নয়—এ তাঁর মনে ওঠে নি, হৃষীকেশ-দারোগাকে কোন কথাই বলেন নি তিনি এ সম্পর্কে। তবু হৃষীকেশ তাঁর হয়ে বলে বসলেন সাহেবের কাছে। তুখোড় লোক, হরসুন্দরের পরম শুভানুধ্যায়ী—করেছেন অবশ্য ভালই। সভার মধ্যে স্যার একবার এমনি যদি পিঠ চাপড়ে দেন, লোকে তাজ্জব হয়ে যাবে—এক শ' গুণ খাতির বাড়বে দশের মধ্যে, ছোঁড়াগুলো হুট করে উঠানে ঢুকতে সাহস পাবে না আর কখনো।

হাটখোলায় সভার আয়োজন হল। হরসুন্দর ও তাঁর পাইক-গোমস্তা এবং তৎ সহ হৃষীকেশ ও তাঁর চৌকিদার-কনেস্টবল উঠে পড়ে লেগে জন-সমাগমের ব্যবস্থা করলেন। বলাই বাঁধুনি দিয়ে দিয়ে খাসা লেখে—হরসুন্দর তাকে দিয়ে বক্তৃতা লিখিয়ে নিয়েছেন। সারারাত জেগে তাই মুখস্থ করলেন। শক্ত শক্ত কথা, কিন্তু চমকদার—মানে না বুঝলেও যত আবৃত্তি করছেন, ততই বিমোহিত হচ্ছেন তিনি। বলাইটা ভাগ্যিস কুটুম্ব-বাড়ি এসে পড়েছিল, নইলে বক্তৃতা লেখাতে সদর অবধি দৌড়তে হত। আর সে সব পেশাদারি লোকের কলমে এমন জিনিস কক্ষণো বেরুত না।

সভার প্রথমেই হরসুন্দরের বক্তৃতা—

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর ঘাতকের কঠিন আঘাতে মাতৃঅঙ্গ ছিন্নভিন্ন। সত্যসন্ধ ভক্ত সন্তান কে কোথায় আছ, প্রতিরোধ কর—

শুধু এই আরম্ভিকাটুকু—আর কিছু শোনা গেল না। সে কি তুমুল উচ্ছ্বাস! আকাশ-বিদারী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি! হরসুন্দর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। জনতা এমন হয়ে উঠল কেন, বুঝতে পারছেন না।

ক্রোধে সাহেবের মুখ রাঙা। হৃষীকেশকে কাছে ডেকে কি জিজ্ঞাসা করলেন। জবাব পেয়ে গলার মালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি ; সেই মুহূর্তে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

কয়েকটা ছোকরা এদিকে লাফাতে লাফাতে এসে হরসুন্দরকে কাঁধে তুলল। খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের উপর এমন করে স্পষ্ট কথা ক-জনে শোনাতে পারে? কোন মানা শুনল না তারা— হরসুন্দরকে কাঁধে নিয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করল। আর 'বন্দে মাতরম্' চিৎকার! মোটের উপর কিন্তু হরসুন্দরের ভালই লাগছে এ সমস্ত।

কিন্তু গভীব রাত্রে বাড়ি ফিরে বিছানার উপর ছটফট করতে লাগলেন তিনি। ঘুম হল না। সকালবেলা ছুটলেন সাহেবের তাঁবুতে। করযোড়ে ক্ষমা চাইবেন। নকুড়-গুরুর পাঠশালায় শিশুশিক্ষা অবধি বিদ্যা—তিনি কি বোঝেন এত সমস্ত? বলাইটার শয়তানি। কুটুম্বর ছেলে—ডুবে ডুবে জল খায়, তা কে জানত?

কিন্তু সাহেবেব সঙ্গে দেখা হল না, সদরে চলে গেছেন তিনি। লোকজন তাঁবুব খোঁটা তুলছে। মাসখানেকেব মধ্যেই একটা বোমা আবিষ্কৃত হল হবসুন্দরের ছাইগাদার ভিতর। এবং জমিজমাও একের পর এক নিলামে উঠতে লাগল।

এই মাসখানেক মাত্র আগে আমি হরসুন্দরকে আবিষ্কার করেছি। না করলেই ছিল ভাল। খবর পেলাম, বিধবা মেয়ের বাড়িতে আছেন তিনি। সংসাবের মধ্যে ঐ তাঁর একমাত্র আপন। সে গ্রাম এখান থেকে ছ-ক্রোশ দূরে। খোঁজে খোঁজে চলে গেলাম।

বাড়ি ঢুকবার আগেই তাঁকে দেখলাম। তখন চিনতে পারি নি, বলে না দিলে চিনবার ক্ষমতা নাই কারও। বলে দিলেও বিশ্বাস

হওয়া শক্ত—ইনি সেই মানুষ। বয়স সত্তরের উপর হয়েছে। গৌরবর্ণ দেহ শণের দড়ির মতো—মনে হয়, খুশিমতো বাঁকানো ও পাকানো যেতে পারে। গামছা পরে পাট-পচানো দুর্গন্ধ নালায় একহাঁটু পাঁকের মধ্যে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মালসার সাহায্যে জল ছেঁচে ফেলছিলেন দু-পাঁচটা চাঁদা-পুঁটি সংগ্রহের প্রত্যাশায়।

তাঁর মেয়ে গিয়ে ডেকে আনল। পুকুরে ডুব দিয়ে খানিকটা ভদ্র রূপে তিনি এসে বসলেন।

বললাম, ছাব্বিশে জানুয়ারি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আমরা উৎসবের আয়োজন করেছি। মস্ত বড় সভা—আপনি তার সভাপতি।

মেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে। কত লোক রয়েছে, ওঁকে কেন? ওঁর কি সে ক্ষমতা আছে?

বলি, ওঁর চেয়ে যোগ্যতর কেউ নেই এ অঞ্চলের মধ্যে। দেশের কাজে নির্যাতনভাগী সকলেই প্রায় গত হয়েছেন। তাই এদ্দূর এসেছি।

হরসুন্দরের দেখলাম খুব উৎসাহ সভাপতি হতে। বললেন, বাগড়া দিস নে তুই অন্ন। আলবৎ পারব—না পারলে উনি এসেছেন কেন এত মুল্লুক ঠেলে? তুই ভেবে রেখেছিস, বাবা কেবল মাছ ধরতে পারে—আর কোন কর্মের নয়।

এক কথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

তারপরে মশায় এই বিপত্তি। ফুলের মালা গলায় দিয়ে এবং সামনে অগণিত মানুষ দেখে পুরাণো স্মৃতি মনে পড়ল বুঝি বুড়োর—বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতো মানুষ উচ্ছ্বসিত আনন্দে সেই একদিন তাঁকে কাঁধে তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেছিল। বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, তেতাল্লিশ বছর আগেকার মুখস্থ বক্তৃতা—

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর ঘাতকের কঠিন আঘাতে মাতৃঅঙ্গ ছিন্নভিন্ন···

দন্তহীন মুখ-নিঃসৃত একটি বর্ণ কেউ বুঝতে পারছে না। বুড়োও বলতে পারলেন না আর-কিছু। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। ক্ষিপ্ত হয়ে সকলে চেঁচামেচি করছে, ঘাড় ধরে নামিয়ে দাও উজবুকটাকে। আমি লজ্জায় অধোবদন। বুড়োর কোটরগত দুটি চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দেখে কষ্ট হয় না, বাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলছে।

বেশি কিছু অঘটন না ঘটে—অন্নর বাড়ি হরসুন্দরকে নির্বিঘ্নে ফেরত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তো আমাব—তাড়াতাড়ি পাঁজাকোলা করে তাঁকে প্লাটফর্ম থেকে নামিয়ে নিলাম। রায় বাহাদুর (না, রায় বাহাদুর আব নন—স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর উপাধি পবিত্যাগ এবং খদ্দর পরিগ্রহণ করেছেন তিনি) নিবারণ মল্লিক বসলেন সভাপতি হয়ে।

এতক্ষণে হরসুন্দর অবস্থা বুঝতে পেরেছেন।

অমন মারমুখি হয়ে উঠল কেন বাবা? সেবার তো এই শুনে কাঁধে তুলে নাচিয়েছিল।

তিক্তকণ্ঠে বললাম, তখন ইংরেজ ছিল—এখন স্বাধীন হয়েছি। আনন্দোৎসবে মড়াকান্না কে সহ্য করতে পারে?

বুড়ো অপ্রতিভ মুখে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—মুখস্থ বক্তৃতা, মানে বুঝতে পাবি নে। সেকালে ধন-জন ছিল, কম বয়স ছিল—তখন নিজের সর্বনাশ ঘটিয়েছি, এবারে তোমার মুখ হাসালাম।

বুড়োব আক্ষেপোক্তিতে কতকটা শান্ত হয়ে বললাম, বক্তৃতা যা-ই হোক—হঠাৎ অমন ডুকরে কেঁদে উঠলেন কেন?

হরসুন্দর বললেন, শয়তান বলাইটার কথা মনে পড়ল বাবা—

সেবার সেই সাত সালেই বলাইর ফাঁসি হয়েছিল এক সাহেবকে গুলি করার অপরাধে।

কুমুদনাথকে জেলে নিয়ে পুরল। জেলার বিনোদ সমাদ্দার অতিশয় ভদ্রলোক—ফর্শা চেহারা, মাথায় টাক। টাকের লজ্জাতেই বোধহয় সব সময় হ্যাট পরে থাকে। অফিসের ভিতর চেয়ারে বসে কাজ করছে—তখনও দেখা যায় মাথা হ্যাটে ঢাকা। কুমুদনাথকে নিয়ে সে শশব্যস্ত হয়ে উঠল।

ইণ্টারভিউর দিন ভয়াবহ কাণ্ড। কুমুদের স্ত্রী ইন্দুরাণী এবং ছোট ভাই নিখিল আসে দেখা করতে। এই দু-জনকে ভিতরে আসতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাইরে লোকারণ্য। কুমুদের জন্য বহু জিনিষপত্র গেটে জমা দেয়। নানা রকমের মিষ্টি, ঘরে তৈরি চন্দ্রপুলি, বই, ফুল, কাপড়-চোপড়, যে সময়ের যে ফল—ইত্যাদি ইত্যাদি। উপহার-সম্ভার দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায়, বাজারে এ সময়টা সেরা জিনিষ কি কি পাওয়া যাচ্ছে। ষোল আনা যে কুমুদের কাছে পৌঁছয়, তা নয়। যা পৌঁছয়, তাতে তার শুধু নয়—জেলখানায় উৎসব পড়ে যায় সকল শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে। দেখা করে বেরুবার সময় অপেক্ষমান জনতা ইন্দুরাণীদের ঘিরে ফেলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিটি কথা শোনে। কেমন আছে কুমুদ, কি রকম তার চেহারা হয়েছে, কি কথা বলল সে। এক কথা বারবার শুনেও যেন তৃপ্তি পায় না।

বিনোদের কোয়ার্টার জেল-গেটের সংলগ্ন দোতলায়। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সে কাণ্ড দেখে, দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাত্র গোটা তিন-চার দেয়ালের ব্যবধানে কুমুদ এসে দাঁড়িয়েছে—এই উপলব্ধি চঞ্চল করেছে বিপুল জনতাকে। শত শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি। লোকের ইচ্ছা—এত কাছাকাছি যখন কুমুদনাথ এসে গেছে, মুখোমুখি দেখা না-ই

বা হল—তাদের ভালবাসা ও একাত্মতা গলার জোরে পৌঁছে দেবে তার কানে। এই অসংখ্য মানুষ এখনো তার অনুগামী, তারই কথা ভাবে, একটুখানি চোখের দেখা পাবার জন্য একান্ত লালায়িত তারা—জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে মনের সেই আকুতি প্রকাশ করে।

বিনোদের বুড়ি মা সভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

কি হয়েছে বাবা? অত চেঁচায় কেন?

বিনোদ বলে, একজন রাজবন্দী এসেছেন অফিস-ঘরে—

ওরে বাবা! কোন্ রাজাকে বন্দী করেছিস, কত প্রজা তার—সমস্ত ভেঙে-চুরে ফেলবে যে! তোদের ওরা গেল কোথায়—বন্দুক-টন্দুক নিয়ে দাঁড়াক।

বিনোদ বলে, তুমি ঘরে যাও মা, এখানে দাঁড়িও না। কিচ্ছু করবে না—চেঁচিয়ে গলা ব্যথা হলে আপনি চলে যাবে।

বাঁধ দিয়ে জলস্রোত আটকে রাখার উপমা বিনোদের মনে এসে যায়। উদ্ধত ইটের পাঁচিলে কুমুদনাথকে আলাদা করে রেখেছে মানুষের সান্নিধ্য থেকে। প্রবল বিক্ষোভের সামনে পাঁচিল যেন থরথর করে কাঁপছে।

মাসখানেক পরে জানা গেল, নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেছে ঐ সমস্ত লোক। জেলখানার পূব দিকে এক খাল। খাল চওড়া বেশি নয়, কিন্তু স্রোত আছে। ওপারে সারবন্দি দালান-কোঠা। বাড়ি-গুলোর সামনে সদর রাস্তা, পিছনের অংশটা এই খালের দিকে। অনেক বাড়ি থেকে পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে খালের জলে; বাড়ির লোক খালে স্নান করে, বাসন মাজে।

বিনোদ খবর শুনল—তারপর এক সময় নিজে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করল—খাল-পারে ঐ সব বাড়ির উঠানে সকালবেলা

লোক জমায়েত হচ্ছে। দু-তিন শ লোকের কম হবে না। দোতলার পূবের বারাণ্ডায় কুমুদনাথ এসে দাঁড়ায়—শুভ্র খদ্দরে আবৃত দেহ, প্রভাত-সূর্যের আলো ঠাকুর-দেবতার মতো তার মুখের চারিপাশে আভা বিস্তার করে। কুমুদকে চাক্ষুষ দেখে নমস্কার করে লোকজন বিদায় হয়ে যায়।

এ পর্যন্তও সহ্য করা চলে। কিন্তু সাহস ক্রমশ বেড়ে চলেছে লোকের। সুউচ্চ কণ্ঠে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন?

কুমুদনাথ হেসে জবাব দেয়, ভাল—

শেষে যুক্তি-পরামর্শও চলতে লাগল এপারে-ওপারে।

সরকারি তোড়জোড় বড্ড বেশি আপনারা জেলে আসবার পর থেকে। কেশবপুর থানার উপর তবু এখনো জাতীয়-পতাকা উড়ছে। একদিন গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি।

কুমুদনাথ বলে, এই শেষ-যুদ্ধ। নেতার মুখ চেয়ে থেকো না। করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা!

খালের ওপার থেকে শত শত কণ্ঠে চিৎকার ওঠে, করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা!

বিনোদের বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। পারতপক্ষে এদের নিয়ে সে ঘাঁটাঘাটি করতে চায় না, চোখে দেখেও যথাসম্ভব চোখ বুজে থাকে। নেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়, চাকরি-জীবনে ঠেকে ঠেকে এই তার শিক্ষা। উপরওয়ালার কানে এ সব তুলতে নেই। রাজবন্দী বড় বেয়াড়া চিজ—রাজ-রাজড়ার মতোই এদের মেজাজের হদিস পাওয়া দায়। মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলতে গেলেও অনেক সময় উল্টো-উৎপত্তি ঘটে। হয়তো বেঁকে বসবে—পূবের বারাণ্ডা থেকে ঘরেই ঢুকতে চাইবে না আর। হয়তো বা খাওয়া বন্ধ করবে। আর খবরের কাগজগুলো অমনি

ঢাক পেটাতে শুরু করবে। তখন সামলাও ঠেলা! অতএব সে একটা কথাও বলল না কুমুদনাথকে অথবা আর যারা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। কিংবা পুলিশ দিয়ে খাল-পাবের জনতাকে তাড়াহুড়ো করল না। শুধু জেল-বিভাগে এক প্রস্তাব পাঠাল, পূবেব দেয়াল আরও উঁচু করা আবশ্যক। বাজবন্দীবা থাকে ঐদিকে, তাদেব পক্ষে পাঁচিল টপকে পালানো একেবারে অসম্ভব নয়। এমনি একটা দৃষ্টান্ত যখন দেখা গেছে হাজাবিবাগ-জেলে।

গাডি গাড়ি ইট বালি সিমেণ্ট এসে পড়ল। জন কুড়িক মিস্ত্রি এক সঙ্গে কাজে লেগেছে। কাজটা তাড়াতাড়ি সমাধা হওয়া দবকার।

বিনোদ ওদিকে গেলে ছেলেবা কলরব করে ওঠে, কি মশায়, কত উঁচু কববেন আর?

বিনোদ বলে, কি করি বলুন। কর্তাব ইচ্ছায় কর্ম। চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখুন না যত খুশি—চাঁদ-সূর্য, কালো মেঘ, সাদা সাদা মেঘ। বাইবে তাকিয়ে মুশকিল করেন কি না! দেয়ালেবও কান আছে, কে কোত্থেকে রিপোর্ট কবেছে—

পাঁচিল আকাশচুম্বী হয়ে আড়াল কবে দিল ওপারেব মানুষ। তবু সকালবেলা জনসমুদ্রের গর্জন ক্ষীণ হয়ে এপারে আসে। ভয় লাগে বিনোদের। বক্ষা এই, মুখেব গর্জনই শুধু—কামান-গর্জন নয়। এ গর্জনে মনে পীড়া দেয়, কিন্তু পাঁচিল ভাঙে না। মন আরও শক্ত করা প্রয়োজন, তখন কিছুই বিঁধবে না আর মনে।

* * * *

পাশা উলটেছে। দেশ স্বাধীন। কুমুদনাথ একজন মন্ত্রী। ইন্দুরাণী হেসে বলে, রাজবন্দীর বন্দী-দশা কাটল। এবারে রাজা।

কুমুদনাথ জবাব দেন, তুমিও ইন্দুরাণী নও আর। ইন্দুটুকু বাদ দিয়ে ডাকব এবার থেকে।

ইংরেজ এত বড় রাজত্ব ছেড়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

কুমুদনাথ বলে, ইচ্ছে করে কি গিয়েছে? এ দেশে থাকা একেবারে অসম্ভব দেখে তখনই পাত্তাড়ি গুটোলো।

ভ্রূ কুঁচকে ইন্দু বলে, ভারি ক্ষমতা তো তোমাদের! অস্ত্রের মধ্যে মুখের বক্তৃতা আর কাজের মধ্যে জেলে গিয়ে বহাল তবিয়তে ভালমন্দ খাওয়া, খেলাধুলা করা, ঘুমানো—

কুমুদনাথ স্বীকার করে নেয়, তা সত্যি। আমরা কে? ইংরেজ তাড়াল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জেলের বাইরে যারা ছিল, তারাই। রাজা বলতে গেলে—ওরাই তো! আমাদের ভালবাসে, বিশ্বাস করে —ওদেরই সেবার জন্য তাই এই চাকরি দিয়েছে।

পুরো বছর কেটে গেছে। সরকারি বাড়িতে আছে এখন তারা। বড় বড় হল, বিশাল কম্পাউণ্ড, কার্পেট-বিছানো সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। ইন্দুরাণীর ষোল বছর একটানা কেটেছে ভাড়াটে বাড়ির একখানা ছোট ঘরে। সকাল-বিকাল উনুন ধরাতে নাকের জলে চোখের জলে হত। সে সব এখন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

সোম আর বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে সাড়ে-ন'টা অবধি কুমুদনাথ দেখা করে সাধারণের সঙ্গে।

কাতার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। নিখিল পার্শন্যাল-সেক্রেটারি হয়েছে—বিচার-বিবেচনা করে জনকয়েককে একের পর এক নিয়ে আসে দোতলার বসবার ঘরে। টং করে ঘড়িতে আওয়াজ হয় সাড়ে ন'টা বাজবার। নিখিল বাইরে এসে বলে, আজকে এই অবধি। আসুন তবে আপনারা। জয় হিন্দ।

ইন্দুরাণী থই পাচ্ছে না এই অনভ্যস্ত পরিবেশে। রোগা একফোঁটা মানুষটি এত বড় বাড়ির মধ্যে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যায়। জেলে না থাকা সত্ত্বেও কুমুদনাথের সঙ্গ তিলার্ধকাল পাওয়া যায় না। জরুরি কাজের জন্যে কোন কোন দিন সন্ধ্যার আগেই সোজা সে বাড়ি ফেরে। ফিরে এসে ফাইলের মধ্যে ডুবে যায়। ইন্দুরাণী রেকাবিতে ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে দরজাব ধারে দাঁড়ায়। পায়ের শব্দে কুমুদ এক নজর তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, কি খবর ?

ইণ্টারভিউয়ে এলাম অনেক খোশামুদি করে আমাদের নিখিল বাবুকে। সেই যেমন সেকালে করতে হত, মনে নেই ?

বোসো—

ইন্দুরাণী বসল সামনের চেয়ারটায়। সেদিন সকালে এক ব্যাপাব হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ আনাগোনা করছিল ইন্দুবাণীর মনের মধ্যে। বলে, আচ্ছা—মানুষ মানুষেব কাছে আসবে, তার জন্য অত কড়াকড়ি কেন তোমাদেব ?

কাজকর্মের অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, কত লোকের কত রকম মতলব থাকতে পারে। সবাইকে তো খুশি করতে পাবি নে। কবা সম্ভবও নয়।

ইন্দুরাণী বলে, অনেকেই তো খুশি নয় দেখলাম। ফটকে এত লোক এসে হল্লা করে গেল, কি ভয় করছিল যে আমার !

কুমুদ বলে, ভয়ের ব্যাপারই হয়ে উঠেছিল। খেতে পাচ্ছে না, কাপড় জুটছে না—মরীয়া হয়ে উঠছে মানুষ। নিখিল ফোন করে দিতে দু-লরি আর্মড-পুলিশ এসে পড়ল। তখন সুড়-সুড় করে সব পালাল।

ইন্দু বলে, পুলিশ-পাহারায় এইরকম থাকতে হবে আমাদের ?

শয়তান মানুষের অভাব নেই। সাবধানে থাকাই ভাল।

ইন্দুরাণীর একবার ইচ্ছা হল—বলে, ছেড়ে দাও এ চাকরি; যেমন ছিলে—চলো তেমনি ভাড়াটে-বাড়ির একতলায়। কিন্তু সে-জীবনের কথা ভাবতে গেলে এখন শিউরে ওঠে সে। এই প্রাসাদ, এমন রাজভোগ, এত খাতির-প্রতিপত্তি সব জায়গায়!

সে শুধু বলল, ঐ যে ওরা ডান হাতের মুঠো আকাশে ছুঁড়ে হুমকি দেয়—প্রতিকার কর এর একটা।

গম্ভীর হয়ে কুমুদনাথ বলে, হবে বই কি! নিশ্চয় হবে।

ভারে ভারে ইট-বালি-সিমেণ্ট এসে পড়ল। ইন্দুরাণী ঠাট্টা করে বলে, পাঁচিল উঁচু করে রাজাকে বন্দী করবার আয়োজন বুঝি?

কুমুদ বলে, যত সব বজ্জাত লোক—নিচু পাঁচিল টপকে হয়তো বা কম্পাউণ্ডের ভিতরই ঢুকে পড়বে। কিছু বলা যায় না ওদের কথা।

এমনি সময় নিখিল এসে বলল, কণ্ট্রাক্টর একবার দেখা করতে চাচ্ছে। পাঁচিলের এদিকে কাঁটা-তারের বেড়া কি রকম ভাবে হবে, সেইটে ভাল করে বুঝে নিতে চায়।

ইন্দুরাণী সরে গেল। গান্ধিটুপি-পরা কণ্ট্রাক্টর—ফর্শা চেহারা। কুমুদনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মাথা নিচু করে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে কণ্ট্রাক্টর বলে, আমায় স্যার চিনতে পারছেন না? রিটায়ার করার পর কণ্ট্রাক্টরি করছি আজকাল।

মাথার গান্ধিটুপি খুলে ফেলল। টাক চকচক করছে। বিনোদ সমাদ্দার।

গান্ধিটুপি

বিপিন গুহর বিষম ভয় হল। কি কাণ্ড রে বাবা! চিবদিন যাদের বেপরোয়া লাঠি-পেটা করে এসেছে, জেল-দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে, তারাই কর্তা হয়ে বসছে। গবর্নমেণ্টের দহরম-মহরম এখন তাদেরই সঙ্গে, আর সকলকে বাদ দিয়ে তাদেব সঙ্গে শলা-পরামর্শ চলছে। এটা চবম কৃতঘ্নতা বলে মনে হচ্ছে বিপিনের। ইংরেজ চলে যাবার সময় তাদের কথা একটুও ভাবছে না—যারা আপন-পর সকলের কাছে নিন্দিত হয়ে বরাবর কর্তাদেব মন জুগিয়ে এসেছে। আর বিপিনের ভাগ্যে শুধু নিন্দা নয়—গালের উপর চপেটাঘাত-প্রাপ্তিও ঘটেছিল। মেবেছিল একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। মেয়ে বলে সে রেহাত করবার লোক নয়। কিন্তু মুরুব্বি বতিপতি চাটুজ্জের কাছে আনুপূর্বিক নিবেদন করবার পব দেখতে পেল, চাটুজ্জে টিপি-টিপি হাসছেন। মেয়েটার বয়স কত, তা-ও জিজ্ঞাসা করলেন একবার। শেষে উপদেশ দিলেন, চেপে যাও বাপু। মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার, কত ফ্যাকড়া বেরুবে এই নিয়ে। স্বদেশিদের অসাধ্য কাজ নেই।

কিন্তু এবাবে এই আসন্ন দুর্যোগেব সঙ্গে তুলনাই হয় না সেবারকার কিম্বা দীর্ঘ চাকরি-জীবনের অপর কোন ঘটনার। অকূলে পড়ে বিপিন আবার সদরে রতিপতির কাছে গেল।

কাণ্ডটা শুনছেন রায় সাহেব?

পরম নির্বিকার ভাব রতিপতির। অন্তত বাইরে থেকে সেই রকম দেখায়। একগাল হেসে তিনি বললেন, দেশি লোকের রাজত্ব হচ্ছে—ভালই তো—আমরাও কিছু বিদেশি নই। চাকরি তো নয়—পেটের দায়ে রীত-রক্ষে করেছি। চুটিয়ে দেশ-সেবা করা যাবে এইবার।

দেখা গেল, কথাবার্তা শুধু নয়—অঙ্গের ভূষাও বদলে গেছে রায় সাহেবের। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন—আধ-ময়লা, চটের মতো মোটা খদ্দরে তৈরি।

বিপিনকে বলে দিলেন, এসেছ তো কতকগুলো নিশান কিনে নিয়ে যাও। থানায় টাঙিয়ে দিও পনেরই আগস্ট।

পনেরই আগস্ট দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটল। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে—অঘটন কিছু ঘটে নি এখনো। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আছে বিপিন। ছোট গঞ্জের উপর থানা—স্বাধীনতার ঢেউ এতদূর অবধি পৌঁছতে সময় লাগবে। কিন্তু পৌঁছবে নিশ্চয় একদিন—তখন যে কি হবে, ভাবতে তার হৃৎকম্প লাগে!

ইতিমধ্যে সদরের পুলিশ-ক্লাব থেকে ছাপানো এক নিমন্ত্রণ-পত্র এল। রতিপতির পদোন্নতি হয়েছে। সাহেব-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিদায় হয়ে সেইখানে বহাল হয়েছেন তিনি। ক্লাবের তরফ থেকে সেই জন্য উৎসবের আয়োজন হয়েছে।

গিয়ে দেখে-শুনে বিপিন তাজ্জব! পুলিশ-ক্লাবের সভায় বেশির ভাগই কংগ্রেসি মানুষ। কয়েক জন বিশেষ পরিচিত তার—এক সময়ে কত পিছন পিছন ঘুরেছে! উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ জোটে নি, আর ইংরেজ-গবর্নমেণ্ট অত্যন্ত সদাশয় বলেই ফাঁসিতে লটকানো যায় নি। আজকে দেখা গেল, এদের সঙ্গে রতিপতি হরিহর-আত্মা। ছোট একটু বক্তৃতাও করলেন রতিপতি। এরই মধ্যে এমন জ্বালাময়ী ভাষা রপ্ত করে ফেলেছেন—স্বকর্ণে শুনেও বিপিনের বিশ্বাস হতে চায় না। চিরদিনই সে পরম বশম্বদ—আজ সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

করলও তাই—লোকজন তখন বিদায় হয়ে গেছে। বলে,

স্বদেশিরা তবে তো লোক নিতান্ত খারাপ নয় রায় সাহেব। অনেক-খানি দুর্ভাবনা কাটল।

রতিপতি নিচু গলায় বললেন, চিরকাল জেলে জেলে কাটিয়েছে, কাজকর্ম বোঝে কাঁচকলা। যেমন ছিলাম, তা-ই রয়ে গেলাম। বরঞ্চ ভালই হল—মাথার উপরের সাদা ভূতগুলো নেমে গেছে, আমাদের পোয়া-বারো। কিন্তু রায় সাহেব বলে আর ডেকো না, খবরদার! উপাধি আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিপিন অবাক হয়ে তাকাল। মুচকি হেসে রতিপতি বলতে লাগলেন, পুরাণো হাল-চাল বদলাতে হবে। যে বিয়ের যে মন্তোর! আচ্ছা, নৃপেন বিশ্বাস মশায় কেমন আছেন বলতে পার? এত করে লেখা হয়েছিল—তিনি এলেন না তো আজকের ব্যাপারে!

নৃপেন বিশ্বাস নামটা চেনা-চেনা লাগছে বিপিনের, সঠিক ধরতে পারছে না।

রতিপতি বললেন, তোমারই এলাকায় তো—বুধহাটায়। খবর রাখ না? নাঃ—তুমি এখনো নেই পবাধীন-ভারতে পচে মরছ। কিচ্ছু হবে না তোমার।

এখন মনে পড়েছে, সে লোকটার নাম নৃপেনই ছিল বটে। কিন্তু একেবারে ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন এলাকায়। ফেরারি আসামির খোঁজ পেয়ে সমস্ত বাত তারা ডোবার ধারে বাঁশতলায় গুঁটিসুঁটি হয়ে ছিল। বাড়িটায় থাকতেন এক বুড়ি আর তাঁর মেয়ে—নৃপেনের আত্মীয়ও তাঁরা নন। বন্দুক-পিস্তল নিয়ে খুব সতর্ক হয়েই তারা জেগে ছিল। কিন্তু কোন-কিছুবই প্রয়োজন হল না, ভোরবেলা কড়া নাড়তে চোখ মুছতে মুছতে নৃপেন দরজা খুলে দিল। প্রস্তুত হয়েই ছিল সে যেন। বুড়ি এত সব জানতেন না—পুলিশ-দলের হাতে-পায়ে ধরতে লাগলেন, মেয়ের ও তাঁর যেন বিপদ না ঘটে। অকথ্য

গালিগালাজ করতে লাগলেন নৃপেনের উদ্দেশে। মেয়েটা কিন্তু মায়ের মতো নয়। বিপিনের নজরে পড়ল, কাপড়ের ভিতর কি নিয়ে গোয়ালের পাশ দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল। ধরতেই বজ্জাত মেয়েটা বাঁ-হাতে বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়ে দিল তার গালে···

এ নৃপেন যে সেই লোকই, তার মানে নেই। এক নাম কত জনের থাকতে পারে! আর হলেই বা কি—এবার যাচ্ছে তোয়াজ করতে। খোশামুদির মন্ত্রে দেবতাকে অবধি প্রসন্ন করা যায়, এরা তবু মানুষ।

খোঁজে খোঁজে বিপিন বুধহাটায় গেল। থানা থেকে নৌকোয় যেতে হয়। থানার দারোগা স্বয়ং এসেছেন শুনে নৃপেনের বুড়ো বাপ ত্রিলোচন তটস্থ হয়ে উঠলেন। কি করবেন, কোথায় নিয়ে বসাবেন—ভেবে পান না।

বিপিন বলল, আলাপ-পবিচয় করতে এলাম নৃপেন বাবুব সঙ্গে! ধরুন, ওঁরাই তো মনিব এখন! না হবেন কেন, কম কষ্ট করেন নি তো দেশের জন্য! তা কি কবতে পারি বলুন আপনাদের ?

ত্রিলোচন বললেন, আমি পেন্সন পেতাম আঠারো টাকা বারো আনা করে। ছেলের দোষে বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার দরখাস্ত করব ভাবছি। আপনারা যদি একটু সুপারিশ করে দেন, সহজে হয়ে যাবে।

বিপিন হেসে বলল, নিশ্চয় আমি করব, একশ-বার করব। কিন্তু এ-সমস্ত কিচ্ছু লাগবে না। কাক-পক্ষীর মুখে একবার আপনার ছেলের নামটা পৌঁলে হয়। পেন্সন ডবল হয়ে যাবে—সুদ সমেত দিয়ে দেবে এদ্দিন যা বকেয়া পড়ে আছে।

নৃপেন কোন দিকে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরল এই সময়। শশব্যস্তে বিপিন উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বিপিন চিনলেও নৃপেন তাকে চেনে নি। বিপিনের হঠাৎ সেই আদালতের ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিন সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে ওদের সম্বন্ধে উপন্যাস রচনা করছিল, আর আসামিরা সে সময় হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে। বয়ে গেছে ওদের তার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্পাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবার! অত নিচুতে ওদের নজর পড়ে না।

ত্রিলোচন সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন, আমাদের থানার ও. সি. ইনি। কি দরকারে তোমার কাছে এসেছেন।

কৌতুক-কণ্ঠে নৃপেন জিজ্ঞাসা করল, কি মশায়, সমন-টমন আছে নাকি?

বিপিন বলে, কি যে বলেন হুজুর! সবাই আসছে, আমিও তাই এলাম।

চালচুলোহীন বাউণ্ডুলেরা আসে। আপনাদের মতো মহাজনদের পায়েব ধূলো পড়লে এখনো গা কেঁপে ওঠে।

বিপিন জিভ কেটে বলল, ছি-ছি, কি বলছেন! আমরা হলাম কীটস্য কীট। আপনারা দেশের গৌরব—আকাশের চাঁদ-সূয্যির সঙ্গে তুলনা হয় আপনাদের।

বটে! এমন হয়ে গেছি এরই মধ্যে? এদ্দিন অবিশ্যি ছিলাম না।

ছিলেন চিরদিনই। বিলাতি শয়তানগুলোর জন্য মুখের বার করি নি। বুক ফেটেছে, মুখ ফোটে নি।

ভূমিকা বেড়ে উৎরেছে—বিপিন আসল কথা পাড়ল এইবার। থানার মাঠে নৃপেনের সম্বর্ধনা-সভা করবে, তাই সে জানাতে এসেছে।

নৃপেন ঘাড় নাড়ে। উঁহু—কাজ নেই। ভালবেসে দেখা করতে এসেছেন, ঐ তো হল। জেল থেকে বেরিয়ে অবধি শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। জ্বর হচ্ছে—অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করছি।

বিপিন বলে, সভার এখনো হপ্তা তিনেক বাকি। ততদিনে সেরে যাবে। অনুমতি দিয়ে দিন, উয্যুগ-আয়োজনে লেগে যাই।

নাছোড়বান্দা একেবারে। নৃপেনের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। ত্রিলোচনের মধ্যস্থতায় অনেক কষ্টে অবশেষে তাকে রাজি করা গেল।

*　　　　*　　　　*

সভার দিন ভোরবেলা বিপিন বড় পানসি নিয়ে বুধহাটার ঘাটে পৌঁছল। তেরঙা নিশান আর পদ্মফুলে পানসির আষ্টেপিষ্টে সাজানো। এই পানসিতে করে নৃপেনকে নিয়ে যাবে। বাড়ির দরজায় পেঁাছল, তখনো কেউ ওঠে নি। বিপিনের আর একদিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন সদলবলে ধরতে গিয়েছিল ফেরারি নৃপেনকে।

সাড়া পেয়ে ত্রিলোচন বাইরে এলেন।

কেন এসেছেন দারোগা বাবু, কাকে নিয়ে সভা করবেন? কাল দুপুরে বুড়ি-বারুণিতে রেখে এসেছি যে তাকে!

হাউ-হাউ করে বুড়ো কাঁদতে লাগলেন। এ অবস্থায় কি করবে, কি বলে সান্ত্বনা দেবে, বিপিন ভেবে পায় না।

এমন সময় স্নেহ-কণ্ঠের ডাক এল, বাবা—

সদ্য-বিধবার বেশে বউটি বেরিয়ে এল। চোখের কোণে অশ্রুর দাগ এখনো শুকিয়ে আছে।.

বাবা, এই যে বললেন আর কান্নাকাটি করবেন না, শান্ত হয়ে থাকবেন। নয় তো বলে দিচ্ছি, আমরাও যেদিকে হয় চলে যাব।

বিপিনের দিকে চোখ পড়ে সে থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কি বলছেন উনি বাবা?

থতমত খেয়ে বিপিন বলে উঠল, এ তো কেউ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।...তা কি করতে পারি বলুন এখন?

তীব্র কণ্ঠে বউটি বলল, মাথা থেকে গান্ধিটুপিটা নামিয়ে ফেলুন। অত পাপ ঢাকা পড়বে না ঐটুকু টুপিতে।

বিপিন চিনল—এই তো সেই মেয়ে, চড় মেরেছিল যে একদিন।

প্রথম কথা*

ফণিভূষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে ঝুপ-ঝুপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। ঘুমের ঘোরে এক-খানা হাত গিয়া পড়িল বধূর গায়ে। চোখ মেলিয়া দেখে, বধূ তারই দিকে চাহিয়া আছে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া বধূ মুখ ফিরাইয়া শুইল। লজ্জিত ফণিভূষণ আরও হাত দুই ফাঁক হইয়া তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া পাশবালিশটা মাঝখানে দিল, পরের মেয়ের গায়ে হাত যাহাতে আর না পড়িতে পারে।

তবু জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি সে একটা কথা বলিয়া উঠে!···

প্রথম যে কথাটি নববধূ তোমার কানে কানে কহিয়াছিল, তাহা মনে আছে কি? মনে পড়িবে না। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করিতেছিল, দু-হাতে প্রাণপণ চেষ্টায় বুক চাপিয়া বসিয়া ছিলে, কেবলই অনুভব হইতেছিল, ইহা আলাপন নয়—অচেনা কিশোরী তার মর্মের সকল মধু কানের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে।···সেদিনের কথা ভাবিয়া দেখিও।

বৈঠকখানায় বরযাত্রীর দল শুইয়াছিল। জানলা-দরজার ছিদ্রপথে শতঘ্নী বাণের মতো রোদ আসিয়া গায়ে বিঁধিতে লাগিল। আবার বাজনদারের দল এমনি বিক্রম শুরু করিয়াছে যে, কান বাঁচাইতে হইলে বখশিস দিতেই হইবে। কেদার মুখুজ্জে মহাশয় উঠিয়া দরজা খুলিলেন। তারপর সকলে উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া ফণিভূষণ সেখানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মেয়ের বাপ নাই, মামাই কন্যাকর্তা।

* বঙ্গশ্রী—আশ্বিন, ১৩৪৬

আয়োজন প্রচুর। বাটি বাটি চা শুইয়া থাকিতেই শিয়রে আসিয়া পৌঁছায়। চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচের ব্যবস্থাও আছে।

মুখুজ্জে মহাশয়ের লোভ হইল, চা জিনিষটা এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এক বাটি লইয়া মাঝে মাঝে উষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইবে! এমনি সময়ে হঠাৎ অন্তঃপুরে কান্নার রোল।

ব্যাপার কি? কেদার চারিদিক তাকাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ফণি? ফণি কোথায় গেল?

মণীন্দ্র তাঁহার বড় ছেলে, ফণির প্রায় সমবয়সি। সে বলিল, আবার তাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেছে। মেয়েরা ঘিরে বসেছেন।

তবেই হয়েছে! কেদার শুষ্কমুখে গাড়ু-হাতে উঠানে নামিলেন। গলা খাটো করিয়া বলিলেন, বাঁচতে চাও তো বসে থেকো না বাবারা। আমি যাচ্ছি ঐ বাঁশ-বাগানে। এমন-তেমন বুঝলে ওখানে গাড়ু ফেলে গিয়ে নৌকো খুলে দেব—

সকলেই চঞ্চল হইয়া অন্তঃপুরের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল। কন্যার মামা লাঠি লইয়া আসিয়া পড়েন বুঝি!

কেদার মুখুজ্জের অনুমান মিথ্যা নয়।

নানারূপ কথাবার্তার মাঝখানে একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জামাইবাবু, আপনি কি কাজ করেন?

ইহার জবাব পূর্বাহ্ণেই তালিম দেওয়া ছিল, বাড়ি থাকিয়া সে বিষয়-আশয় দেখে। ফণিভূষণ নির্ভুল উত্তর দিল।

আর কিছু করেন না?

ও-অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার বলিয়া ফণির খ্যাতি আছে।

এমন মজলিসে সেই বাহাতুরিটুকু না লইয়া সে পারিল না। বলিল, আর ঘোড়ায় চড়ি।

না, ঘোড়ার ঘাস কাটেন ?

তা-ও কাটি।

মাইনে কত ?

মাইনে দেয় না, চড়তে দেয়।

মেয়েদের হাসি থামিয়া গেল। বেশ বোঝা গেল, ঠাট্টা-তামাসার কথা ইহা নয়। জামাই সত্যই ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন এবং কৃষ্ণেব জীবেব জন্য প্রত্যহ ঘাস কাটিয়া আনেন। ঘোড়াব মালিক মণীন্দ্র মুখুজ্জে। সে বিবেচক ব্যক্তি, মাঝে মাঝে ফণিকে চড়িতে দিয়া থাকে।

জেরার মুখে আরও প্রকাশ পাইতে লাগিল, যে দোতলা বাড়ি কন্যাপক্ষকে দেখান হইয়াছিল, বাপ মবিবাব সময়ে সেটা ফণিবই ছিল বটে, কিন্তু তাহাব পব দেনাব দায়ে কেদাব মুখুজ্জে দখল করিয়াছেন। তা বসিয়া সে নিবাশ্রয় নয়, পুকুরপাড়েব কসাড় বৈঁচিব জঙ্গল কাটিয়া কেদাবই নিজ খরচে এক খড়ের ঘর তুলিয়া দিয়াছেন। আবার গত বছর জমাজমি যা-কিছু ছিল সমস্তই কেদাবকে লিখিয়া দিয়া সে একেবাবে নির্ঝঞ্ঝাট হইয়াছে। কিন্তু বিয়েব উৎসাহ বড় প্রবল ; কেদারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ভাল জায়গায় সম্বন্ধ ঠিক কবিয়া দিবেন।

কনের মা জানলায় কান রাখিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে ছিলেন, তিনি ডুকবাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মামা আসিয়া পড়িলেন, আরও লোক জমিতে লাগিল। সমস্ত কথা শুনিয়া মামা ঘাড় নাড়িলেন, বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া বিয়ে-বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্বেব ভিড়—এ সব চুকিয়া যাক, দশের মধ্যে মান তো বাঁচুক—সকল কথা তাবপব ভাবা যাইবে।

মেয়ের মুখ সেই হইতে অন্ধকার। কনে-বিদায়ের সময় বলির শেষে কবন্ধ পশুর মতো সে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে লাগিল। মা-ও আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রাবণ মাস। দিনভোর বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু রাত্রিবেলা মেঘ কাটিয়া দিব্য জ্যোৎস্না ফুটিল। চারিদিক ভিজে-ভিজে, কে যেন বড় কান্না কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া এখন চুপ করিয়াছে। প্রহরখানেক রাতে জোয়ার আসিল। পাশের নৌকায় বুড়ারা বিপুল চিৎকারে পাশায় মাতিয়াছেন। দুই নৌকা পাশাপাশি বাঁধা হইল। এ নৌকার এক কামরায় বধূ ও ঝি, আর একটিতে ফণিভূষণ ও বরযাত্রীর দল। নরম চকচকে বালুময় তীরভূমি। সকলে নামিয়া সেইখানে মাদুর পাতিয়া হারমোনিয়াম লইয়া বসিল। ফণিভূষণ উঠিল না, নৌকার মধ্যে চুপচাপ শুইয়া।

মাঝের দরজাটা একবার ফাঁক করিয়া সে দেখিল, ঝি নাক ডাকাইতেছে। বধূও সম্ভবত ঘুমাইতেছে, অন্যদিকে মুখ ফেরানো। মুখ তুলিয়া একটা বার যদি কোনরকম একটু আলাপ করিত! অনেকক্ষণ সে তাকাইয়া রহিল, অনেক ইতস্তত করিল। অবশেষে মুখ বাড়াইয়া চুপি-চুপি ডাকিল, ওগো—

চমকিয়া বধূ মুখ ফিরাইয়া তাকাইল। ঘুমায় নাই, চোখে কান্নার দাগ শুকাইয়া আছে। এক নজর চাহিয়া আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সাহস করিয়া ফণি আরও একবার চেষ্টা করিল। বধূ সাড়া দিল না।

ইতিমধ্যে পাশাখেলা ভাঙিয়া কেদার মুখুজ্জে ও-নৌকার গলুয়ে আসিয়া বসিয়াছেন। ফণিকে ডাকিলেন। তটস্থ হইয়া সে বাহিরে দাঁড়াইতে কেদার সগর্বে বলিতে লাগিলেন, যে কথা সেই কাজ— দেখলে তো? কত সুহৃৎ তোমার কাছে চুকলি কেটেছিল, কেদার

মুখুজ্জে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছে—বিয়ে-থাওয়া কিচ্ছু দেবে না। বলো এখন, কথা রেখেছি কি না?

বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় ফণি অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

উপর হইতে মণীন্দ্র ডাক দিল, ফণি-দা, কি করছ ওদিকে? শোন—

হারমোনিয়ামের কোলাহল হইতে নিভৃতে এদিকে সরিয়া আসিয়া মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, একা-একা কি করছিলে বল দিকি? বউদির সঙ্গে ভাব জমাচ্ছিলে? কি বললে বউ?

নিরতিশয় ম্লান মুখে ঘাড় নাড়িয়া ফণি বলিল, কিছু না—

তুমি বোকা। ওরা কি আগে কথা বলে? কত সাধাসাধি করতে হবে, তবে তো! আগে কথা বললে তুমিই আবার ভাববে, কি রকম বেহায়া বউ!

আমি তো কতবার ডাকলাম, তবু কথা বলে না।

মণীন্দ্র অভয় দিয়া বলিল, বলবে, বলবে—এখনো বাকি আছে। ও অনেক খোশামোদ করতে হবে—সোজা নয়।

তারপর আসল কথা পাড়িল। খাওয়া-দাওয়ার কি হবে এ বেলা? ক্ষিধে লাগছে যে!

ফণি চুপ করিয়া রহিল। বধূর অশ্রুম্লান মুখখানি বড় মনে আসিতে লাগিল। খাওয়ার কথা এ সময়ে তার ভাল লাগিল না।

মণীন্দ্র বলিল, মিছে আলসেমি করে কি হবে দাদা, দুটো ভাতে-ভাত চাপিয়ে দাও চরের উপর। চাল-ডাল আছে—সমস্ত রয়েছে—

কেদার মুখুজ্জে নামিয়া আসিতেছিলেন। শেষ কথাটি কানে গেল। বলিলেন, না—ওকে দিয়ে রাঁধিও না। ও হল বর—আজকের দিনটে আর কেউ রান্না করুক।

মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, ঢেঁকির আবার স্বর্গবাস! চিরকাল করে এল, বর হয়েছে তো শিঙ বেরিয়েছে নাকি?

কিন্তু শিঙ বাহির না হইলেও ফণির কি-যেন একটা হইয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া—কোনদিন যাহা করিতে সাহস পায় না—তাহাই করিল। বলিল, আমি পারব না।

মণীন্দ্র বিস্মিত হইল। তবু মৃদু হাসিয়া বলিল, আমরা না হয় উপোস করলাম, কিন্তু বউ পরের মেয়ে—তার ভাবনা ভাবতে হয় একবার!

কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ফণি নৌকার মধ্যে চুপচাপ গিয়া বসিল। জোয়ার-জল কল-কল করিয়া কূল ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, বধূর শুকনা মুখখানির কথা। তারপর ভাবিল, কি হইবে আলস্য করিয়া? ভাত রান্না হইতে কতক্ষণই বা সময় লাগিবে! ও-পাশের কামরায় নিঃসাড় হইয়া বধূ তেমনি পড়িয়া আছে; ওখানেই চাল, ডাল, রাঁধিবার সমস্ত মালমশলা। পা টিপিয়া টিপিয়া সেখানে গিয়া সমস্ত গোছাইল। তারপর ফিরিয়া দেখে, ইতিমধ্যে কোন্ সময়ে উঠিয়া বধূ দরজা চাপিয়া বসিয়া আছে।

বধূ কথা বলিল—কিছুমাত্র সাধাসাধি করিতে হইল না—এমন লজ্জার কাণ্ড কেহ কখন শুনিয়াছ কি? বেহায়া বউ নিজ হইতে কথা বলিল, দরজায় পিঠ দিয়া পথরুদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি যাবেন না রাঁধতে—

মণীন্দ্র ডাকিতেছে, উনুন ধরিয়েছি ফণি-দা, এসো শিগগির।

বধূ বলিল, আপনি যদি যান ওখানে, আমি এই গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

তাহার গৌর গণ্ডদু'টি বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আংটি*

পান-তামাক তো মুহুর্মুহু। তার উপর বেলা একটু গড়াইয়া আসিতেই রেকাবি-ভর্তি লুচি ইত্যাদি আসিয়া হাজির। গণেশচরণ খাসা লোক, দৃষ্টি সকল দিকে। পাশার ছকটা আপাতত গুটাইয়া রাখা গেল।

এই সময়ে নিধিরাম ভারি ব্যস্ত ভাবে গণেশকে আসিয়া কি বলিল। গলা খাটো করিয়াই বলিয়াছিল, এবং আমরাও রেকাবির দিকে কিঞ্চিৎ বেশি মনোযোগ দিয়াছিলাম, কথাটা ভাল রকম কানে যায় নাই। মোটের উপর সেই পুরানো ব্যাপার। অর্থাৎ আশু-দা'কে লইয়া পুনশ্চ কি এক কাণ্ড বাধিয়াছে।

গণেশ হন্তদন্ত হইয়া ছুটিল। ফিরিতে অনেক দেরি। আমি ছাড়া আর সকলে তখন সরিয়া পড়িয়াছে। আসিয়া হাতপাখা লইয়া খুব খানিকটা বাতাস খাইল। বলিতে লাগিল, ছি-ছি-ছি! আমার মাথা কাটা যায়, তা বুঝবেন না। এমন দুর্ভোগ আমার!

মাথা-কাটার হেতুটা ক্রমশ ব্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রোশ পাঁচেক দূরে কোথায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া আশুর কলেরা হইয়াছিল। বাড়ির কর্তা যা করিবার করিয়া বুড়াকে গরুর গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। এখন তাহাকে উপরের ঘরে শোয়াইয়া গরুর গাড়ির ভাড়া মিটাইয়া দুই মেয়ে ও মেজ ছেলেকে পাশে বসাইয়া রাখিয়া তবে আসিতে হইল। তাই এত দেরি।

আশুতোষ গণেশের বৈমাত্র বড় ভাই। তাকে লইয়া বেচারার দুর্ভোগের পার নাই সত্য। আট টাকা মাহিনায় তহ্‌শিলদারি করিতে করিতে গণেশ এখন নিজেই ছোটখাটো কয়েকটা তালুক

* নূতন পত্রিকা—মাঘ, ১৩৪২

লইয়া বসিয়াছে। এ অঞ্চলে মানসম্ভ্রম যথেষ্ট। পয়সা হইয়াছে—তবু বড় ভাইকে যেমন মান্য করে, এই কলিযুগে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু আশুর চিরদিনের উদ্ভট স্বভাব—এমন চক-মিলানো বাড়ি, ছেলে-মেয়ে, চাকর-বাকর, এতসব সুখ-আরামে বুড়ার যেন গায়ে জ্বালা চড়িয়া যায়। এই দেখা গেল, দিব্য আছে, খায়-দায় ঘুমায়—হঠাৎ বিকাল হইতে আশুর আর দেখা নাই··· খোঁজ্ খোঁজ্—কোথায় পাইবে? তিন-চারি দিন পরে পান চিবাইতে চিবাইতে হাসিমুখে আসিয়া হাজির। বলে, কি করি বলো, তিনকড়ি মিত্তিরের সঙ্গে আজকের চেনা তো নয়! ন-মেয়ের বিয়ে—বলল, দাদা, দেখে শুনে শুভকর্মটা সেরে দিয়ে দাও—

রাগ করিয়া গণেশ বলে, চেনা না হাতী! কাকপক্ষীর মুখে শুনে দাদা দৌড়ও—বলি, এ বাড়িতে কি ভাত জোটে না? লোকে যে আমায় নিন্দে করে।···বলো, কি খেতে চাও? বাড়িতে বলে না পাও যদি—

বুড়া হাসিয়া প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দেয়, আচ্ছা আচ্ছা—আর যাব না। হল তো? কিন্তু কেবল এ মুখের কথা। নিমন্ত্রণের নূতন খবর আসিতে যে ক'টা দিন দেরি!

গণেশের অনুরোধে আমরাও কখন কখন বুঝাইতে গিয়াছি, না আশু-দা, ও সব রীত ছেড়ে দিন। হাজার হোক গণেশের পজিশন আছে। আপনি তার ভাই—ছিঃ—

ইহার ফল উল্টা হইত। বুড়া রাগিয়া অগ্নিশর্মা। দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ নামাইয়া বলিত, আমার এই কলা! ঘোড়ার ডিম হবে আমার! বউ নেই, ছেলেপিলে নেই—কিসের তোয়াক্কা? সুখের পায়রা—যেখানে ফূর্তি, সেইখানে আছি। ভাই-বেরাদার কেউ কারও নয়—সব ডোণ্টো-কেয়ার করি—

দিন-কয়েক পরে যথারীতি পাশা খেলিতে গিয়া শুনি, গণেশ বাড়ি নাই। এক ছিলিম তামাক খাইয়া চলিয়া আসিব, তামাক সাজার হুকুম দিয়া দিয়াছি। এমন সময়ে ফটফট জুতার শব্দ করিয়া আশু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। ছেঁড়া ময়লা জিনের কোটের উপর কোঁচানো চাদর উঠিয়াছে। নিমন্ত্রণের বেশ না হইয়া যায় না! পিছনে গণেশের বড় মেয়ে নীহারকে দেখিয়া আর সন্দেহমাত্র রহিল না। মেয়েটা আমাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিল।

বুঝুন চাটুজ্জে মশায়, এই সেদিন এ-রকম হল। আবার কি যাওয়া উচিত? আর অত্যাচার সইবে না শরীরে।

হঠাৎ আশু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। খুব সইবে, খুব—খুব। কত সয়েছে জানিস না তো!

নীহার তখন হাত ধরিয়া ফেলিল। উঠে আসুন, জেঠা মশায়—

বুড়া উঠিল না, বাহির হইয়াও গেল না। ধপ করিয়া তক্তা-পোশের উপর বসিয়া ঠোঁট চাপিয়া হাসিতে লাগিল। মেয়েটি আবদারের সুরে বলিতে লাগিল, কোনদিন—কোথাও আপনার আর যাওয়া হবে না। জানেন, এই ইয়ে—আমি গার্জেন হয়েছি। যদি যান, কি যাবার চেষ্টা করেন—দেখবেন কি করি—

আচ্ছা তাই। তোর বাবাকে আংটি ফিরিয়ে দিতে বল্।

হঠাৎ বুড়ার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, বিশ বছর হয়ে গেল, দেয় না কেন? দিয়ে দিক। তারপরে যদি যাই কোথাও···এই চাটুজ্জে মশাই ব্রাহ্মণ মানুষ—পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

সভয়ে পা সরাইয়া লইলাম। আংটির কথা বুড়ার মুখে আরও যেন দু-একবার শুনিয়াছি। কথাটা জানিতে কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের আংটি আশু-দা?

গজমোতির—আশু বলিবার আগে নীহার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

তারপর গলা নামাইয়া বলিল, মিছে বক-বক করে কি হবে জেঠা মশায় ? উপরে চলুন।

আমার প্রশ্নটা চাপা দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। বুড়া কিন্তু ছাড়িবার লোক নয়। বলিল, শুনবেন ? সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ, চাটুজ্জে মশাই। বিয়ের আংটি। ঐ যে আমার ভাইটি—সামনে ভিজে বেড়াল—ঐ বাপের কুপুত্তুর আমার আংটি চুরি করেছে। এত বলি—কিছুতে বের করবে না।

নীহার এক মুহূর্তে ছিটকাইয়া হাত দশেক দূরে রণরঙ্গিনীর মতো দাঁড়াইল। বলিল, বাবার কিনা আংটির অভাব! নিজে হারিয়ে ফেলে বাবার নামে কলঙ্ক। কেউ ও-কথা বিশ্বাস করবে না। ভারি তো বিয়ে, তার আবার আংটি!

বস্তুত বিশ্বাস করিবার কথাও নয়। কি এমন আংটি যে গণেশ-চরণ বাবু যাইবে তাহা চুরি করিতে!

বুড়া কিন্তু সমান তেজে জবাব দিয়া চলিতেছে, বিয়ে যা-ই হোক—বিয়ের কথা তো হচ্ছে না। হচ্ছে আংটির কথা।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া তার গলার স্বর ভারি হইল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, সত্যি বলছি চাটুজ্জে মশাই, বউ মরায় কষ্ট হয় নি—নাপিতে-পুরুতে মিলে সাত পাক ঘুরিয়ে দিল। আধ-মরা এক মেয়ে—ঐ সব ধকল আর সামলে উঠতে পারল না। কিন্তু আংটি তো আর মরা সোনার ছিল না মশাই। যেদিন আংটি গেল, আমি সামলাতে পারি নি, কেঁদে ফেলেছিলাম—

ইহার অনেক পরে আশু-দার বিয়ের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। গণেশ তখন তহ্‌শিলদারিতে দু-পয়সার মুখ দেখিতে শুরু করিয়াছে। আশুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—যাত্রার দলে অ্যাক্‌টো করিয়া বেড়ায়। গণেশের বিয়ের কথাবার্তা হইল—বেশ ভাল সম্বন্ধ—দেনা-

পাওনা ভালই। কিন্তু মুশকিল আশুকে লইয়া। বড় ভায়ের এই রকম অবস্থা—সে ঘরবসত না করিলে ছোট ভাই কি করিয়া করে? গণেশ নিজে উদ্যোগী হইয়া আশুর বিয়ের ঘটকালি করিল। ছয় বেহারার পালকিতে দাদাকে তুলিয়া পালকির আগে আগে লণ্ঠন হাতে এক-মাত্র বরযাত্রী হইয়া সে-ই চলিল। আশু খুব খুশি। রাজা রুক্মাঙ্গদ সাজিয়া রাণীকে যে-সব সম্ভাষণ করিত, নিধিরামের সঙ্গে যুক্তি করিয়া তাহারই দু-চারিটা বাসরঘরের জন্য শানাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু সময়-কালে দেখা গেল, অসুবিধা নানাবিধ। এক নম্বর, বধূর বয়স মাত্র সাত-আট—যুক্তাক্ষরবহুল সম্বোধন শুনিয়া সে বেচারি কাঁদিয়া আকুল। দুই নম্বর ক্রমশ প্রকাশ পাইল, কান্নার হেতু কেবল যুক্তাক্ষরের আতঙ্ক নহে, ঐ সঙ্গে উদরব্যাপী প্লীহার কষ্ট। বাড়ি গিয়া গণেশকে আশু বিষম তাগিদ দিতে লাগিল, একটা ডি. গুপ্ত কিনে দাও ভাই, বিকেল হলে তোমার ভাজ-ঠাকরুনের গায়ে আগুন ছোটে।…আজ কাল করিতে করিতে খবর আসিল, গায়ের আগুন পাকাপাকি রকম নিভিয়াছে, ডি. গুপ্তর আর আবশ্যক হইবে না।

গণেশ অভয় দিয়া কহিল, বেশ তো দাদা, আর কুলের হ্যাঙ্গাম রইল না। মৌলিকের মেয়ের অভাবটা কি? ফাল্গুনের দিকে ফের দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে গণেশচরণের বউ আসিল, ছেলে হইল, ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল, তারপর ছেলে-মেয়ে আরও পাঁচটা হইয়াছে—অনেক ফাল্গুনই আসিয়া গিয়াছে। আশুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কিন্তু বিয়ের আংটি হাতে ছিল, সেইটা কোথায় যে গিয়াছে—ইদানীং যত বয়স হইতেছে, বুড়া ক্ষেপিয়া যাইতেছে। যার তার কাছে বলে, আংটি হারিয়েছে বুঝি? রামোঃ,—চুরি হয়েছে। শোন তবে সাতকাণ্ড রামায়ণ—

কিন্তু সপ্তকাণ্ড শুনিবার লোক মেলে না।

বাপের অপমানে নীহারের কিন্তু ভারি লাগিয়াছে। সে ব্যঙ্গের সুরে বলিতে লাগিল, কি রকম আংটি সেটা? কত টাকা দাম? আপনার শ্বশুর খেতে পেত না, বাবার কাছ থেকে আড়াই কুড়ি টাকা বাজিয়ে নিয়ে তবে মেয়ে বেচেছিল। সে কি হাজার-তু'হাজার টাকার আংটি দিয়েছিল? বলুন, আমার দিকেই ফিরে বলুন না—

কিন্তু আশু উহার সকল প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বলিতে লাগিল, পাথর-বসানো ঝকমকে আংটি চাটুজ্জে মশাই। মতি বেনের দোকানে আট টাকায় কেনা—শ্বশুর আমায় নিজ মুখে বলেছিলেন। আংটি ফিরিয়ে দিক। আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান—আপনার সামনে দিব্যি করছি, ওর মুখ হেঁট হয় তেমন কাজ আমি কক্ষণো করব না।

ইতিমধ্যে গণেশ কখন আসিয়াছে, টের পাই নাই। সে থামাইয়া দিল। থামো দাদা, থাম্ না খুকী—

কাছে আসিয়া আশুকে একেবারে তুলিয়া ধরিল। বলিল, চলো দাদা ওপরে। চুরি করে থাকি, করেছি। সে তো আট টাকার আংটি। তোমাকে আমার নিজের আংটিটা দিয়ে দিচ্ছি। হল তো? কিন্তু এ-রকম পথে পথে বেড়াতে পারবে না। নিজে কষ্ট পাও, আমাদেরও ভাবিয়ে মারো।

সত্যই সে হাতের আংটি খুলিয়া দিল। গণেশচরণের মতো মানুষ ভূ-ভারতে হয় না। একদিন আশু-দা'কে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন? আর তো আংটির তুঃখ নেই। খুশি হয়েছ?

কিন্তু বুড়া কি খুশি হইবার লোক? নাক সিটকাইয়া বলিল, কিসে আর কিসে! সে আংটি আমার ঢের ভাল ছিল মশাই।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম, মীনা-করা হীরার আংটি—অবশ্য

কম-দামি হীরা—তবু আট টাকার আংটির শোক ইহার পর আর কোনক্রমে পুষিয়া রাখা চলে না।

অকস্মাৎ এক নিদারুণ শোকের ব্যাপার ঘটিল। কপাল-ভরা সিঁদুর লইয়া নীহারের মা তিন দিনের জ্বরে সতীলোকে চলিয়া গেলেন। গণেশ আমাদের সামনে কাঁদিয়া খুন। তারপর সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া সে বিবাগী হইয়া বসিল। পাশার আড্ডা উঠিল।

এমন করিয়া তো চলে না। মাস দুই পরে জবরদস্তি করিয়া গণেশকে লইয়া মেয়ে দেখিতে গেলাম। কিন্তু শুভকর্মে সে রাজি নয়। আশু তখন রুখিয়া উঠিল, বিয়ে করবে না—বললেই হল? আমি বর্তমান থাকতে ভাই আমার ভেসে বেড়াবে? ওর কথা কে শুনছে? তোমরা ঠিকঠাক কর।

বরযাত্রী আমরা দশ-বারো জন। বিধবার মেয়ে—নিতান্ত গরিব। বিয়ে তো চুকিয়া গেল। আশু এতক্ষণ বরকর্ত্তার যেমনটি হইতে হয়—অতিশয় গম্ভীর ভাবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছিল, মাঝে মাঝে সমজদারের মতো মাথা নাড়িতেছিল। হঠাৎ ইসাবায় আমাকে ও নিধিরামকে কাছে ডাকিয়া কহিল, ইয়ে—ঐ যে আংটি দিয়েছে··· ঐ দেখ না গণেশের হাতে—আমার ছিল ঠিক ঐ রকম।

নিধিরাম মুখ বাঁকাইয়া কহিল, আ মরি-মরি—কি আংটি দিয়েছে জামাইকে! সোনা নয়, ও কেমিকেল। সোনা কি ঐ রকম হয়?

তৎক্ষণাৎ বিরক্তিতে তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আশু ফিস-ফিস করিয়া আমার কানে কানে কহিল, ঐ আংটিটা আমায় দিতে বলো। তা হলে আর ঘোরাঘুরি করে বেড়াব না। তুমি ব্রাহ্মণ মানুষ, এই তোমার পা ছুঁয়ে বললাম। ওর হীরের আংটি ও নিকগে, ওতে আমার দরকার কি?

হীরার আংটি আশু আঙুল হইতে খুলিয়া ফেলিল।

শাস্তি*

পেট-কাটা ঘরের পাশে ডুমুরতলা। তার ওদিকে উঠানে বিস্তর মানুষ জমায়েত হইয়াছে। অতএব আর আগাইয়া আসা চলে না। ঐ ডুমুরতলায় দাঁড়াইয়া নানারূপ নির্বাক ভঙ্গি করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কমলা ভাইটিকে ডাকিতেছিল।

কিন্তু পান্নালালের যাইবার উপায় নাই।

দিদির সঙ্গে ইতিমধ্যে দু-একবার চোখোচোখি হইয়াছেও। কিন্তু এক মহা আশ্চর্য কাণ্ড! একটা লোক গুঁটিখেলা দেখাইতেছে। এই দেখা গেল, লোকটার হাতের মধ্যে একটিমাত্র গুঁটি; সেটা দুই-তিন-চারিটি হইয়া যায়। একবার গোটা দুই-তিন গালে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া কান দিয়া পেট-গলা-হাত-পা যে যে-অঙ্গের নাম করিতেছে, সেইখান হইতে গুঁটি বাহির হইতে লাগিল। চারিপাশে ছেলেবুড়োর ভিড়। লোকটার বুজরুকি ধরিয়া ফেলিতে কাহারও চেষ্টার কসুর নাই। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না।

কমলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে। এমন সময় কোন দিক দিয়া হারাণ পালিত আসিয়া উপস্থিত। বুড়া চেঁচাইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি গো বড়মানষের গিন্নি, এমন চুপচাপ যে! তোমার দলের সবাই ওখানে, তুমি একলাটি··· আনন্দময়ীর মুখ এমন শুকনো কেন গা—কি হয়েছে?

এই বুড়াটি সহজ পাত্র নয়। এতটুকু কাল হইতে কমলাকে যা জ্বালাইয়া আসিতেছেন। তখন বুঝিত না, কাঁদিয়া ভাসাইত—এখন পলাইয়া বেড়ায়। ইদানীং আবার বুড়ার ভাণ্ডারে তাহার সম্বন্ধে

* প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩৯

নূতন বিশেষণ জুটিয়াছে—বড়মানষের গিন্নি। সলজ্জ হাসিয়া কমলা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে হারাণ বলিলেন, তা বটে—এখন পাখনা যে কাটা! নাতজামাই মানা করেছে? তখনই বললাম—দিদি, বিদেশিরে মন দিও না, বুড়োর সঙ্গে স্বয়ম্বরা হও।

দায় পড়িয়াছে নাতজামায়ের মানা করিতে! আর করিলেই বা কে শোনে? কমলা যাইবে না—তাহার খুশি তাই যাইবে না। শেষে ওখানে দশজনের মধ্যে তুমি বুড়া এই রকম ফের শুরু করিয়া দাও!

হারাণ হাসিতে হাসিতে উঠানে ঢুকিলেন। কমলা কহিল, দাদামশায়, পান্নুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন। একবার শুনে যাক, মোটে একটা কথা—তারপর আবার গিয়ে দেখবে ঐসব—

একটু পরেই খেলা ভাঙিল। পান্নালাল লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া উৎসাহ ভবে কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল—কমলা অমনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আচ্ছা ছেলে তো তুমি···সেই কখন এসেছ, আর ফিরবাব নামটি নেই। যা বলেছিলাম মনে আছে?

পান্নু খুব সপ্রতিভ ভাবে ঘাড় নোয়াইয়া বলিল, হাঁ—

কি বল্ দিকি?

তুই মার হাঁড়ি থেকে চুরি করে আমসত্ত দিবি—

তা দেবো। আর, আসল কথাটা?

আমসত্তের কথার উপরেও আসল কথা যে আব কোনটা হইতে পারে, তাহা পান্নালাল ভাবিয়া পাইল না। অবাক হইয়া দিদিব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলা কহিল, আমসত্ত দেবো না কচু দেব তোমাকে। বললাম, পোস্টাপিসে গিয়ে চিঠি দেখে এসো—

গিয়েছিলাম। হঠাৎ বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়া পান্নালাল চমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, দিদি, চিঠি এসেছিল।

তাই এতক্ষণ নিয়ে বসে আছিস তুই? একদৌড়ে দিয়ে আসতে বলি নি? কার চিঠি, দেখি।

পান্নু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, উঠোনে বুঝি ফেলে এসেছি! তুই দাঁড়া—আমি এক্ষুণি নিয়ে আসি—

বলিয়া সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠানের দিকে দৌড়িল।

কমলা দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক ক্ষণ পরে দেখা গেল, পান্নু ফিরিতেছে। খালি হাত, কাঁচুমাচু মুখ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। মুখ ঘুরাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কমলা কহিল, বেশ, লক্ষ্মী ছেলে! খুইয়েছ তো? যেখানে পাস, সেখান থেকে এনে দিতে হবে তোকে! নইলে আজ কেটে দু-খানা করব—তখন দেখবি ছেলে!

পান্নু নিরুত্তর। কমলা বলিতে লাগিল, পই-পই করে বলে দিলাম, একছুটে আমায় দিয়ে যাবি···পাজি ছেলে—

পান্নু ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে জবাব দিল, আসছিলাম তো! এমন সময় ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখাতে এল যে—

যাও, আবার দেখে এসোগে। আমি দাড়াচ্ছি এখানে। যাও—

আরও একবার খোঁজাখুঁজি করিয়া অনেক পরে সে ফিরিয়া আসিল। চিঠি পাওয়া গেল না।

ভাই-বোনে নির্বাক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। খানিক পরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কার চিঠি? কি রকম ধারা চিঠি রে?

খাম—

সবজে খাম?

সাদা।

গন্ধ-মাখা?

তা আমি শুঁকে দেখি নি। খেলা দেখাতে এল, আমি চিঠি হাতে নিয়ে বসেছিলাম।

অবশ্য সাদা এবং নির্গন্ধ খাম হইলেই যে নীরেনের চিঠি হইতে পারে না, এমন নয়। এমনি উন্মনা ভাবে খানিকটা চলিতে চলিতে কমলা কহিল, কোথায় ফেললি বল দিকি পান্নু, কার হাতে পড়বে··· ছি-ছি! একবিন্দু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর।

দিদির নরম সুরে পান্নু সাহস পাইল। ঝড়টা বুঝি কাটিয়া গিয়াছে! আগাইয়া আসিয়া কমলার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল, আমসত্ত এখন দিবি তো? ও দিদি, গিয়েই?

দিচ্ছি—বলিয়া কমলা তাহার গালে কষাইয়া দিল এক চড়। তারপর আর একটা। আর পান্নু অমনি বাঘের মতো তাহার উপর পড়িয়া মারিয়া আঁচড়াইয়া চুল টানিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া তুলিল। কমলা আর সামলাইতে পারে না।

রও ছেলে, গুরুজন না আমি? মাকে বলে তোমার মজা দেখাচ্ছি। চলো বাড়ি—

কিন্তু তাহার আগেই 'ও মাগো—' বলিয়া গগনভেদী চিৎকার তুলিয়া পান্নু গৃহাভিমুখে ছুটিল। এবার কমলার ভয় হইল। মায়ের বকুনি—সে যাহা হয় এক রকম হইবে, কিন্তু হতভাগা ছেলে পত্র-ঘটিত সব কথা যদি বলিয়া দেয় কেলেঙ্কারির আর-কিছু বাকি থাকিবে না। জোর পায়ে আগাইয়া কাছে গিয়া ডাকিল, পান্নু!

পান্নুও গতিবেগ বাড়াইল এবং কান্না আর এক পর্দা উঁচুতে উঠাইল। পিছন হইতে কমলা কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল, ও পান্নু, দাঁড়া একটু ভাই—লক্ষ্মীটি, দাঁড়া। এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে আমসত্ত দেব।

পান্নু একমুহূর্ত পিছনে তাকাইল। কথাটা প্রত্যয় করিতে পারিল না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিতে লাগিল, পোস্টাফিসে আমি তো গিয়েছি, তবু কেন তুই মারলি? শুধু শুধু কেন মারবি তুই আমায়? আমি মাকে বলে দেবো—

কাছে আসিয়া ভাইয়ের চোখ মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কমলা বলিতে লাগিল, চুপ···চুপ! কাউকে কিছু বলতে নেই—

পান্নু জো পাইয়া গেল। এক্ষুণি গিয়ে সব বলব—

না—বলে না, ছিঃ!

এক্ষুণি—

এ ভাবে হয় না দেখিয়া কমলা ধমক দিয়া উঠিল, কি হয়েছে? কি বলবি তুই?

পান্নুর রাগ একটু যা শান্ত হইয়া আসিতেছিল, পুনবায় তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বলিল, বলে দেব আমি—বলে দেবোই—তুই মার হাঁড়ি থেকে আমসত্ত চুরি করে দিস, কতদিন দিয়েছিস, সব আমি বলে দেব—

এই কথা? তা বলগে যা—বলিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল। নির্ভাবনায় পাশে কুন্তীদের বাড়ি ঢুকিয়া পড়িল। পান্নু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কি করা যায়। নানারূপ ইতস্তত করিয়া সে-ও দিদির পিছু লইল।

মেটে-ঘরের অন্ধকার কোণে দুই সখী মহানন্দে গল্প করিতেছিল। পান্নু সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কেহই মনোযোগ করিল না।

কেহ কিছু বলে না দেখিয়া অবশেষে পান্নুই কথা বলিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বলে দেবো না দিদি—

আচ্ছা—বলিয়া কমলা কুন্তীর সহিত যে প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাহারই কি একটা জবাব দিল। দু-জনে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

পান্নু দাড়াইয়া আছে। ক্ষণ পরে কহিল, ও দিদি, চল্। সাড়া না পাইয়া পুনরায় কহিল, বেলা যে পড়ে গেল—কখন যাবি?

কোথা?

হাসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস-ফিস করিয়া পান্নু বলিল, সেই যে বললি বাড়ি গিয়ে আমসত্ত দিবি—যাবি নে?

হাসিমুখে কুন্তী জিজ্ঞাসা করিল, কি বলে ?

রসভঙ্গে কমলা বিরক্ত হইয়াছিল। বলিল, কোথাও একদণ্ড থির হয়ে বসবার জো আছে ? রাক্ষস ছেলের কেবল খাবার বায়না। বলছে, আমসত্ত দাও।

তার আর কি হয়েছে ! তুমি বোসো পানুবাবু, আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। কত খাবে খেও—বলিয়া কুন্তী আমসত্ত আনিতে বাহির হইয়া গেল। কমলাও সেই সঙ্গে। ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, পানু নাই—চলিয়া গিয়াছে।

কমলা কহিল, বাড়ি চলে গেছে। ঐ যে তোর সামনে রাক্ষস বললাম—ভায়েব আমার মান গিয়েছে। সত্যি কুন্তী, আমি ভাবি অনেক সময়, অনেকদিন নেবো-নেবো করছে—গিয়ে সেখানে থাকব কেমন করে ? পানুকে সঙ্গে নিয়ে যাব—

কুন্তী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পারবি লো পারবি—একবার বরের ঘর করে দেখ—শেষে আর ভাই-টাই কিছু মনে থাকবে না—

কমলা আপন মনেই বলিয়া চলিল, তার উপর আজ আবার খামকা মেরে বসলাম। মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে গেছে—পাঁচটা আঙুলের দাগ পড়ে গেছে···আজ একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছে।

চিঠি ? কবে এল রে ? কি লিখেছে, দেখালি নে আমায় ?

কমলা বিমর্ষ মুখে বলিতে লাগিল, আমিই বড় দেখতে পেলাম ! বড্ড ভাবনা হয়েছে ভাই, এখন একটু ইয়ে চলছে—মানে সেই চিঠির পর থেকে। আমার অপরাধ, একবার দু-দিন দেরি হয়েছিল চিঠি দিতে—তাই হেনো-তেনো কত কি লিখল ! আমিও তেমনি কড়া কড়া জবাব দিয়েছি।

কুন্তী বলিল, বেশ করেছিস, খুব করেছিস। ওদের ঐ কেবল

লম্বা লম্বা কথা। মুরোদ তো ভারি! আবার দেখিস, সামনে এসে কি রকম করবে—

কিন্তু কমলা ইহাতে বিশেষ ভরসা পাইল না। বলিতে লাগিল, কি যে মতিগতি হল, কেন যে লিখলাম! বড্ড ভয় হচ্ছে ভাই, যদি রাগের মাথায় দেশান্তরী হয়ে যায়। পান্নু হতভাগা চিঠিখানা হারিয়ে এল, আজকে আবার কি লিখেছে কে জানে? .

বলিয়া চিন্তাকুল মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বাড়ি যাই—কেউ যদি চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে বাড়ি দিয়ে এসে থাকে—

অবমানিত পান্নু বাড়ির কাছাকাছি গিয়া আবার সশব্দে কান্না জুড়িয়া দিল। মা ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন।

কি হল রে? কে মেরেছে?

দিদি—বলিয়া পান্নালাল রোয়াকের উপর আছড়াইয়া পড়িল। যেন একদম খুন হইয়া গিয়াছে, এইরকম ভাব।

মা বলিলেন, আসুক আগে হতচ্ছাড়া মেয়ে! তুমি লক্ষ্মীমাণিক, কেঁদো না। জামাইবাবু এসেছে, ঐ বৈঠকখানায় রয়েছে, কি মনে ভাববে—কাঁদতে নেই।

পান্নু চমকিয়া চুপ করিল।

তারপর মা কাজকর্ম করিতে লাগিলেন, পান্নু পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দিদির অপরাধের বিবরণ দিতে লাগিল। এক একবার জিজ্ঞাসা করে, ও মা, শুনছিস?

কর্মব্যস্ত মা উত্তর করেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আসুক আগে আজ—

কিছু পরেই কমলা বাড়ি ঢুকিল। পান্নু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার মায়ের সামনে পড়িলে হয়! দিদি তো জানে না, কি নিদারুণ অস্ত্র ইতিমধ্যে তার জন্য শানাইয়া রাখা

হইয়াছে! এক একবার ভাবে, অত করিয়া নালিশ না করিলেও হইত। একটা থামের আড়ালে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল।

মা ক্রুদ্ধভাবে চাপা গলায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, সন্ধ্যে হয়ে যায়, ধিঙ্গি মেয়ের বাড়ির কথা মনে থাকে না। জামাই এসেছেন—নিয়ে যাক এইবার চুলের মুঠি ধরে। এমন কথার অবাধ্য তুমি!

সন্ধ্যার আবছা আলোয়· ভাল করিয়া ঠাহর হয় না—তবু পান্নালালের কেমন মনে হইল, গালাগালি খাইয়া দিদির মুখ-ভাব যেরূপ হইবার কথা, ঠিক তেমনটি হইল না।

মা পুনশ্চ বকিয়া উঠিলেন, হাত-পা কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলে. গা-ধোয়া চুল-টুল বাঁধা হবে না? বাক্স খুলে ঢাকাই শাড়ি বের করে নাও।

বলিয়া ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছা ফেলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

পান্নু তো অবাক! শাস্তির পালা শেষ হইয়া গেল নাকি?

কমলা কহিল, চল্ পান্নু, খিড়কির পুকুরে একটু দাঁড়াবি—

পান্নু জোরে ঘাড় নাড়িল।

কমলা কাছে আসিয়া ভাইকে আদর করিয়া মান ভাঙাইয়া চুপি-চুপি কহিল, শুনলি তো, আমার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে—নিয়ে গেলে তখন তো আর বলব না! চল্ ভাই—

অতঃপর নিরাপত্তিতে পান্নু পিছে পিছে চলিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, জামাইবাবু বড্ড খারাপ লোক—না?

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ। মনে মনে ভাবিল, মিথ্যাও বড় নয়—সামান্য খুটিনাটি লইয়া যে রকম রাগারাগি করে! বলিল, আমি চলে গেলে তুই বাঁচিস, না রে পান্নু?

পান্নু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, সত্যি কি জামাইবাবু তোর চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যেন কত দুঃখে কত ভাবনায় কমলা কহিল, নিয়ে গেলেই বা করছি কি ভাই বল্? তুই তো ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবি নে—

পান্নুও ইহার উপর কিছু ভরসা দেখিতে পাইল না।

কমলা আপন মনে গা ধুইতেছে এবং আসন্ন রাত্রির জন্য মনে মনে মুশবিদা করিতেছে, এমন সময় পিছনে আঘাটার দিকে ঝপ করিয়া কি পড়িল। তাকাইয়া দেখে, পান্নালাল কাপড় খুলিয়া রাখিয়া জলে নামিয়াছে এবং সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া কলমিদামের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত ছুটাছুটি লাগাইয়াছে।

ও কি হচ্ছে রে?

দিদি, মাছ···মাছ— উৎসাহের প্রাবল্যে সে ভাল করিয়া উত্তরই দিতে পারিল না। অনতিদূরে নলবনের দিকে জল ভাঙিয়া চলিতে লাগিল।

যাস নে পান্নু, ও দিকে সাপ থাকে। লক্ষ্মীসোনা, কথা শোন্—

কিন্তু কে কার কথা শোনে? অবশেষে কমলা গিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল। উঠে আয় লক্ষ্মীছাড়া, উঠে আয় শিগগির—

বেগতিক দেখিয়া পান্নু দিল দিদির হাত কামড়াইয়া। তখন কান ধরিয়া পিঠে আর একটা কিল দিয়া কমলা তাহাকে ডাঙায় তুলিয়া দিল। পান্নু ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখনই মনে পড়িল, বাড়িতে জামাইবাবু—কাঁদিতে নাই। পাড়ের উপর গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

গা ধোয়া সারিয়া কমলা হাত ধরিয়া টানিল। বাড়ি চল্—

বারুদে আগুন লাগার মতো পান্নু একেবারে ছিটকাইয়া উঠিল। মুখপুড়ি, তুই মর—এক্ষুণি মর—বাড়ি গিয়ে আমি সব বলে দেব।

কমলা হাসিয়া কহিল, বলিস—খুব বলিস, আমার বয়ে গেছে। তুমি এতক্ষণ কিছু না বলে ছেড়েছ—তেমনি লক্ষ্মীধন কিনা ?

পান্নু বলিল, তোর চুলের মুঠো ধরে নিয়ে যাবে জামাইবাবু। খুব হবে—আমি মজা দেখব।

কিন্তু মনে মনে মায়ের বিচার-পদ্ধতির উপর পান্নালালের সত্যসত্যই অনাস্থা জন্মিয়া গিয়াছিল। এবারে দিদির সঙ্গে সে আর খিড়কিতে ঢুকিল না; সোজা বৈঠকখানায় উঠিল। ঘরে আলো দিয়া গিয়াছে, নীরেন একাকী পড়িয়া পড়িয়া চুরুট টানিতেছিল।

এই যে! এস এস বড়বাবু, এতক্ষণ দেখি নি—বলিতে বলিতে নীরেন উঠিয়া বসিল। বলিল, কান্না শুনছিলাম কার ?

কান্নার কথায় পান্নু খুব লজ্জিত হইল। নীরেনের প্রতি শ্রদ্ধাও হইল। জিমনাস্টিক-করা দিব্য লম্বা-চওড়া গোঁফ-পাকানো প্রকাণ্ড চেহারা। হাঁ—নালিশ করিতে হয় তো এই লোকের কাছেই। নির্ঘাৎ শাস্তি।

পান্নু বলিল, জামাইবাবু, দিদি আমাকে মেরেছে—

বটে ? ভারি অন্যায় তো!

উৎসাহিত হইয়া পান্নালাল কহিল, দু দু-বার মেরেছে। আপনি ওকে আচ্ছা করে মেরে দেবেন।

নিশ্চয়ই, কোথায় তোমার দিদি ?

উপরের ঘরে আছে ঠিক—

নীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। এত বড় নালিশের পর বিচারকের পক্ষে অবহেলায় সময় কাটানো চলে না। কহিল, আর কে কে আছেন সেখানে ?

কেউ নেই। মা রান্নাঘরে।

আচ্ছা—বলিয়া নীরেন বীরবিক্রমে অগ্রসর হইল। আয়োজন

দেখিয়া পান্নুও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। কিন্তু দু দু-বার মার খাইয়া প্রতিহিংসায় মন জ্বলিতেছিল, সে আর কিছু বলিল না। নীরেন বাহির হইয়া গেল।

কমলার প্রসাধন তখনও শেষ হয় নাই। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নীরেন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর কহিল, এক শো মাইল দূর থেকে এলাম। ভদ্রলোককে একবার বসতেও বলছ না। খুব ভদ্রতা শিখেছ।

কমলার জবাব নাই, ঘোমটাও কমে না।

আমায় দেখে তোমার রাগ হয়েছে কমলা? আচ্ছা, এই যাচ্ছি চলে—বলিয়া চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইতে কমলা কথা কহিল। মৃদুস্বরে কহিল, তাই বলেছি বুঝি আমি?

একটা কথা বলছ না, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে—অবশ্য তোমাকে দোষ দিতে পারি নে—

নীরেনের কণ্ঠস্বর অতিশয় কাতর হইয়া উঠিল, বলিতে লাগিল, এতে আমি তোমাকে একবিন্দু দোষ দিই নে কমলা। মহাপাষণ্ড আমি—তাই ঐ রকম মর্মঘাতী চিঠি লিখতে পেরেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর—

বলিতে বলিতে—সে কথা জনসমাজে খুলিয়া বলা উচিত নয়, সেই মহাবলবান জিমনাস্টিক-করা যুবক তার সাত ফুট লম্বা দেহ লইয়া একেবারে কমলার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, রাগের মাথায় চিঠি ডাকে ফেলে দিয়ে তারপরেই বুকে যেন মুগুর মারতে লাগল। ভাবলাম, এ চিঠি পেয়ে অভিমানিনী আমার আত্মহত্যা করে বসবে। তাই কাউকে কিছু না বলে সকালের ট্রেনে ব্যাগ হাতে করে উঠে বসলাম।

হঠাৎ নীরেন এক টানে কমলার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। তার

সন্দেহ হইয়াছিল, কমলা কাঁদিতেছে বুঝি! ঘোমটা খুলিয়া দেখে, হাসি মুখ। দেখিয়া তৃপ্তি পাইল। বলিল, আমার চিঠিটা পড়ে তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে—না?

কমলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখেছিলে তুমি?

জান তো আমার যত পাগলামি! তুমি চিঠি পড় নি?

না। পান্নু সে চিঠি হারিয়ে ফেলেছে।

বাঁচা গেছে—বলিয়া নীরেন সশব্দে একচোট হাসিতে যাইতে ছিল। কমলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল, আঃ—আস্তে গো আস্তে! নিচে মা রয়েছেন যে!

হাসি সামলাইয়া নীরেন কহিল, তবে তো পান্নুবাবু খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর সেই পান্নুকে তুমি মেরেছ? শোন—তোমার নামে মস্ত বড় নালিশ, দু দু-বার মেরেছ তুমি—

কমলা বলিল, ঐ চিঠি হারিয়েছে বলে একবার। আর একবার—

কথা শেষ করিতে না দিয়া নীরেন বলিয়া উঠিল, হারিয়েছে তো বেশ করেছে। সেইজন্য মারবে তুমি? পান্নু বলেছে, তোমায় খুব করে শাস্তি দিতে। কোন কৈফিয়ৎ শুনছিলে আর—

যাও—

না। অত বড় উপকারি যে, তার কথা ফেলব আমি? শাস্তি আমি দেবোই—কিছুতে ছাড়ব না। না-না-না—

বলিয়া প্রবল পরাক্রমে শাস্তি দিবার উপক্রম করিতেই পান্নালাল কোথা হইতে মাঝখানে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল।

ও জামাইবাবু, আমার দিদিকে তুমি মেরো না—আমি আর নালিশ করব না।

সন্ত্রস্তভাবে কমলাকে বলিতে লাগিল, শিগগির তুই পালিয়ে আয় দিদি। আমি আর কোনদিন কাউকে কিছু বলব না—

———